BANGLABOOK.COM

"বিদেশী সে রাজপুত্র, এ পথে কখনো আসে নাই,
হারায়ে ফেলেছে পথ, অশ্ব তার গেছে মরে, তাই
হেঁটে হেঁটে এসেছে সে, পা দু'খানি ফেটে গেছে তার।
আফিম ফুলের মত ঘুমে ভরা চোখ দু'টি। রাজার কুমার
হেঁটে হেঁটে এসেছে সে, ধূলিকণা মেখেছে সে মাখনের গায়ে
এসেছে সে আমাদের গাঁয়ে।"

বুদ্ধদেব বসু, রূপকথা

বই মেলা
২০০১

আজ চিত্রাদের বাড়ির পরিস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক। অথচ বাড়ির সবাই ভাব করছে যেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। আজকের দিনটা আলাদা কোনো দিন না। অন্য আর দশটা দিনের মতোই। সবাই অভিনয় করে স্বাভাবিক থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অভিনয় করে স্বাভাবিক থাকা বেশ কঠিন ব্যাপার। চিত্রাদের বাড়ির কেউই অভিনয়ে তেমন পারদর্শী না। কাজেই বাড়ির সবাইকে খানিকটা অস্বাভাবিক লাগছে। সবচে অস্বাভাবিক লাগছে চিত্রার মা শায়লা বানুকে। সামান্য কোনো উত্তেজনার বিষয় হলেই তাঁর প্যালপেটিশন হয়, কপাল ঘামতে থাকে, ঘন ঘন পানির পিপাসা পায়। এই তিনটিই এখন তাঁর হচ্ছে। অথচ ভাব করছেন কিছুই হচ্ছে না। তাঁর সামনে পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাস। কিন্তু তিনি এখনো গ্লাসে চুমুক দেন নি।

BANGLABOOK.COM

তারা সবাই অপেক্ষা করছে একটা টেলিফোন-কলের জন্যে। চিত্রার মেজোখালা উত্তরা থেকে টেলিফোনটা করবেন। বিশেষ খবরটা দেবেন। ইয়েস অথবা নো।

চিত্রার বিয়ের আলাপ-আলোচনা চলছে। বরপক্ষের লোকজন দুই দফা মেয়ে দেখে গেছে। কিন্তু তাদের কথাবার্তা মোটেই স্পষ্ট না। হ্যাঁ-না বলা দূরে থাকুক, কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত দিচ্ছে না।

ছেলে সবার খুব পছন্দের। লম্বা, গায়ের রঙ বিলেতি সাহেবদের মতো। বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। ছেলের বাবার ঢাকা শহরেই তিনটা বাড়ি। তার চেয়েও আশ্চর্য কথা তাদের নাকি লন্ডনেও একটা বাড়ি আছে। ছুটি কাটাতে তারা যখন লন্ডন যায় তখন হোটেলে ওঠে না, নিজেদের বাড়িতে ওঠে। ছুটি কাটাতে সব সময় যে লন্ডন যায় তাও না। গত বছর গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। বড়লোকদের দু'টা ভাগ আছে। এক ভাগ হলো সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া গ্রুপ। ছুটি ছাটায় এরা সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়ার বাইরে যেতে পারে

না। আরেক ভাগ আমেরিকা-লন্ডন গ্রুপ। চিত্রার যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে সে আমেরিকা-লন্ডন গ্রুপের।

সেই তুলনায় চিত্রারা কিছুই না। ঢাকা শহরে তাদেরও একটা বাড়ি আছে। দোতলা ফাউন্ডেশনের একতলা বাড়ি। এই বাড়ির জন্যে ব্যাংকে লোন আছে বিশ লাখ টাকা। প্রতি দু'মাস পরে পরে ব্যাংক থেকে একটা চিঠি আসে। তখন চিত্রার মা শায়লা বানুর মুখ শুকিয়ে যায়। সংসার চালানো, ব্যাংকের লোন দেয়া, দুই মেয়ের পড়াশোনা সবই তাঁর একার দেখতে হয়। চিত্রার বাবা চৌধুরী খলিলুর রহমান মোটেই সংসারী মানুষ না। তিনি এজি অফিসের বিল সেকশানের নিচের দিকের অফিসার। চাকরি শুরু করেছিলেন হেড এসিসটেন্ট হিসেবে। দু'টা প্রমোশন পেতে তাঁর কুড়ি বছর লেগেছে। অফিসে যাওয়া, অফিস থেকে ফেরা। মাঝে মধ্যে অফিস থেকে ফেরার পথে টুকটাক কাঁচাবাজার করা ছাড়া সংসারে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই।

শায়লা বানু সংসারের এই অবস্থাতেও মোটামুটি ভেলকি দেখিয়েছেন। যাত্রাবাড়িতে সাড়ে তিনকাঠা জমির উপর বাড়ি করেছেন। রাজমিস্ত্রি ডেকে বাড়ি বানিয়ে ফেলা না, রীতিমতো আর্কিটেক্ট দিয়ে ডিজাইন করে বাড়ি বানানো। বাড়ির অর্ধেকটা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়ার টাকায় ব্যাংকের লোন শোধ দেয়া হচ্ছে। তিনি নিজে এনজিওতে একটা চাকরি যোগাড় করেছেন। সন্ধ্যার পর তাঁকে কাজে যেতে হয়। বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার একটা প্রকল্পের তিনি শিক্ষিকা। এই চাকরিতেও তিনি খুব ভালো করছেন। শিক্ষিকা থেকে তিনি এখন হয়েছেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর। এনজিও'র বেতন ভালো। বেতনের একটি টাকাতেও তিনি হাত না দিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করেন। টাকাটা জমা হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের খরচের জন্যে। তা ছাড়া এই বাড়ি তাঁর দোতলা করার ইচ্ছা। দোতলা হয়ে গেলে পুরো একতলাটা তিনি কোনো এনজিওকে ভাড়া দিয়ে দেবেন। সে রকম কথাও হয়ে আছে।

তিনি যে অবস্থানে আছেন সেখান থেকে মেয়ের এত ভালো বিয়ে আশা করা ঠিক না। তিনি আশাও করেন নি। চিত্রা খুবই সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু গায়ের রঙ ময়লা। বাংলাদেশে মেয়ের সৌন্দর্যবিচারে গায়ের রঙের ভূমিকাই প্রধান। গায়ের রঙ ধবধবে শাদা হলে ট্যারা চোখের মেয়ে, ভালো করে তাকালে যার নাকের নিচে সূক্ষ্ম গোঁফ দেখা যায় তাকেও রূপবতী হিসেবে গণ্য করা হয়। শাশুড়ি পাড়া-প্রতিবেশীকে খুব আগ্রহ করে বউ দেখাতে দেখাতে গোপন অহঙ্কার নিয়ে বলেন— আমার বউয়ের গায়ের রঙটা ময়লা, খুব শখ ছিল— রঙ দেখে বউ

আনব। কি আর করা, সব শখ তো পূরণ হয় না।

শায়লা বানুর সব শখই মনে হয় পূরণ হতে যাচ্ছে। খুবই আশ্চর্যজনকভাবে আমেরিকা-লন্ডন গ্রুপের একজন পাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। চিত্রা কার্জন হল থেকে যাচ্ছিল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে। এর আগের দিন বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় পানি জমে আছে। সে সাবধানে ফুটপাত দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার পাশ ঘেঁষে একটা পাজেরো জিপ গেল এবং তাকে পানিতে-কাদায় মাখামাখি করে ফেলল। এরকম পরিস্থিতিতে গাড়ি কখনো দাঁড়ায় না। দ্রুত চোখের আড়াল হয়ে যায়। চিত্রার ব্যাপারে সেরকম হলো না। গাড়ি একটু সামনে গিয়েই ব্রেক কষে দাঁড়াল। গাড়ি যে চালাচ্ছিল সে নেমে এল (অত্যন্ত সুপুরুষ এক যুবক। গায়ের রঙ সাহেবদের মতো। উচ্চতা ছয় ফুট এক ইঞ্চি। পরনে মার্ক এন্ড স্পেনসার কোম্পানির গাঢ় নীল ব্লেজার।) যে নেমে এল তার নাম আহসান খান। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। এই হলো যোগাযোগের সূত্র।

এই যোগাযোগের মধ্যেও ভাগ্যের একটা ব্যাপার আছে বলে শায়লা মনে করেন। বিয়ের ব্যাপারটা নাকি পূর্বনির্ধারিত। শায়লা বানুর ধারণা আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন— এখানে বিয়ে হবে। সে-কারণেই চিত্রা কাদা-পানিতে মাখামাখি হয়েছে। তবে তিনি ঠিক ভরসাও পাচ্ছেন না। ছেলেপক্ষের মানুষরা, হ্যাঁ-না। মেয়ে পছন্দ হয়েছে, মেয়ে পছন্দ হয় নি এইসব কিছুই বলছে না। ছেলে যে খুব আগ্রহী তার আগ্রহেই বিয়ে হচ্ছে এরকমও মনে হচ্ছে না। ছেলে খুব আগ্রহী হলে টেলিফোন করত বা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে চিত্রার খোঁজ করত। তাও করে নি। বরং পাত্র পক্ষের মধ্যে কেমন গা-ছাড়া গা-ছাড়া ভাব। মেয়ে দেখতে অনেক মিষ্টিটিষ্টি নিয়ে আসে এটাই নিয়ম। ওরা এনেছে একটা কেক। সোনারগাঁও হোটেলের দামি কেক এটা সত্যি, তারপরেও তো কেক। বিশাল কোনো কেক না, চার পাউন্ডের কেক। চিত্রা যখন চা নিয়ে ওদের সামনে গেল তখন ছেলের মা হঠাৎ মোবাইল টেলিফোন নিয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চিত্রার সঙ্গে কোনো কথা নেই— চিত্রার দিকে ভালো করে তাকালেনও না। কার সঙ্গে বিরাট গল্প জুড়ে দিলেন। টেলিফোনেই হাসাহাসি। এমন কোনো জরুরি টেলিফোন নিশ্চয়ই না। বয়স্ক একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি ঘরে ঢোকার পর থেকে গভীর মনোযোগ দিয়ে টাইম পত্রিকা পড়া শুরু করলেন। পত্রিকা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। চিত্রা তাঁর সামনে চায়ের কাপ দিতেই তিনি বললেন, সরি আমি চা-কফি কিছুই খাই না। বলেই আবার টাইম পড়া শুরু করলেন।

শায়লা বানু প্রচুর খাবারদাবারের আয়োজন করেছিলেন। ঘরে তৈরি পিঠা, চটপটি, সমুচা, পরোটা, মাংস, মিষ্টি, ফলমূল। এত খাবার দেখে অন্তত ভদ্রতা করে বলা উচিত ছিল— "এত আয়োজন।" সেসব কিছুই না। ছেলের ছোটচাচা শুধু একটা পাটিসাপটার অর্ধেকটা নিলেন, হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ভেতরের ক্ষীরটা বের করে খোসার অর্ধেকটা খেলেন। ছেলের মা শুধুই এককাপ চা। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দু'টা চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখলেন এবং আবারও মোবাইল টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

চিত্রা সম্পর্কে শায়লা বানুর অনেক কিছুই বলার ছিল। কি কি বলবেন সব গুছিয়েও রেখেছিলেন। কথাগুলি এমনভাবে বলবেন যেন মেয়ের বদনাম করা হচ্ছে। আসলে বদনামের আড়ালে প্রশংসা। যেমন— আমার মেয়েটা খুবই খেয়ালি। তার খেয়ালির জন্যে মাঝে মাঝে এমন বিরক্ত লাগে। এস.এস.সি. পরীক্ষার দু'দিন আগে হঠাৎ সে সব বইপত্র গুছিয়ে তুলে ফেলল আর পড়বে না। তার নাকি পড়া শেষ। আমি অনেক ধমকাধমকি করলাম, রাগারাগি করলাম, কিছুতেই বই খুলবে না। বই দেখলেই তার নাকি বমি আসে। বললে বিশ্বাস করবেন না এক মাস পরীক্ষা চলল, এই এক মাস সে বই খুলল না। আমি তো ধরেই নিয়েছি এই মেয়ে পাস করবে না। রেজাল্ট বের হলে দেখি ছয়টা লেটার পেয়েছে। আর দশ-পনেরো নাম্বার পেলে প্লেস থাকত।

পড়াশোনার এই অংশ বলা হবার পর— গানের ব্যাপারটা নিয়ে আসতেন। মুখে বিরক্তি নিয়ে বলতেন, মেয়েটার গানের গলা এত ভালো, কিন্তু গান করবে না। তার নাকি ভালো লাগে না। টিচার রেখে দিয়েছি। সপ্তাহে দু'দিন আসে, সঙ্গে তবলচি আসে। সে রেয়াজ করবে না। গানের স্যারের সঙ্গে রাজ্যের গল্প। তবলচির সঙ্গে গল্প। একদিন দেখি সে তবলচির কাছ থেকে তবলা বাজানো শিখছে। মেয়েমানুষ তবলা বাজাচ্ছে দেখতে কেমন লাগে বলুন তো! টিভিতে যেদিন গানের অডিশন দিতে যাবে, আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি সঙ্গে যাব। হঠাৎ সে বেঁকে বসল অডিশন দিতে যাবে না। তার নাকি ইচ্ছা করছে না। শেষপর্যন্ত রাজি হলো, কিন্তু শর্ত দিয়ে দিল— বাড়িতে কোনো মেহমান এলে আমি বলতে পারব না, চিত্রা-মা একটা গান শুনাতো। বলুন এই মেয়েকে নিয়ে আমি কী করি? শেষপর্যন্ত তার শর্তেই রাজি হলাম। প্রথম অডিশনেই পাস করল। সে এখন টিভিতে নজরুলগীতিতে এনলিস্টেড। প্রতি তিন মাসে একটা করে প্রোগ্রাম পায়। সেই প্রোগ্রামও সে মিস করে। গতবার প্রোগ্রামটা ইচ্ছা করে মিস করল। সেদিন তার বান্ধবীর জন্মদিন। সে টিভিতে যাবে না। বান্ধবীর

জন্মদিনে যাবে। শিল্পকলা একাডেমি থেকে টার্কিতে একটা গানের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পেয়েছিল। সরকারি অনুষ্ঠান কত সম্মানের ব্যাপার। অথচ কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারলাম না।

এই গল্প শোনার পর ছেলেপক্ষের কেউ-না-কেউ অবশ্যই বলবে, বাহ্ খুব তো গুণী মেয়ে, দেখি একটা গান শুনি।

শায়লা বানু সেই ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। তবলচি এনে রেখেছিলেন। সঙ্গে একজন বাঁশিবাদক। কোন গান চিত্রা গাইবে সেটাও ঠিক করে অনেকবার করে গাওয়ানো হয়েছে—

পথ চলিতে যদি চকিতে
কভু দেখা হয় পরাণ প্রিয় ॥

শায়লা বানু মেয়ের গান শুনানোর কোনো সুযোগই পেলেন না। গুছিয়ে রাখা কোনো কথাই কেউ শুনল না। বরং তাঁকে অত্যন্ত অপমানসূচক একটা কথা শুনতে হলো। ছেলের মা বললেন, আপনাদের বাথরুমটা একটু ব্যবহার করব। বলেই একপা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, বাথরুম পরিষ্কার আছে তো?

অপমান গায়ে লাগার কথা। শায়লা বানুর নিজের পরিষ্কারের বাতিক আছে। তাঁর বাড়ি তিনি ছবির মতো গুছিয়ে রাখেন। তাঁকে কি-না বলা বাথরুম পরিষ্কার আছে তো? ড্রয়িং রুমের সঙ্গের বাথরুমটা তিনি ঘষে ঘষে চকচকে করে রেখেছেন। বাথরুমের বেসিনের উপর ছোট্ট টবে চার ধরনের অর্কিড রেখেছেন। বাথরুমে এয়ার ফ্রেসনার দিয়েছেন। তাঁর ধারণা এই বাথরুম যত পরিষ্কার ছেলেপক্ষীয়দের কোনো বাথরুম এত পরিষ্কার না।

শায়লা বানু সৌখিন মানুষ। তিনি তাঁর বাড়ির সামনে গোলাপবাগান করেছেন। সেই বাগানে চল্লিশ ধরনের গোলাপ আছে। তিন রকমের বাগানবিলাস লাগানো হয়েছে। সেই গাছ বড় হয়ে বাড়ির ছাদ পর্যন্ত উঠেছে। বাড়ির সামনের একটা অংশে তিনি রেখেছেন রঙিন মাছের জন্যে। ছোট্ট চৌবাচ্চা, পাড়টা মার্বেল দিয়ে বাঁধানো। চৌবাচ্চায় কিছু রঙিন মাছ। এই মাছের জন্যে শায়লা বানুকে কম কষ্ট করতে হয় না। মাছের খাবার দিতে হয়, প্রতিদিন পানি পরিষ্কার করতে হয়। সন্ধ্যাবেলায় মাছগুলিকে চৌবাচ্চা থেকে তুলে জারে করে ঘরে নিয়ে আসতে হয়। এইসব ব্যাপারে বাড়ির কেউ যে তাঁকে সাহায্য করে তা-না, বরং উল্টোটা করে। চিত্রার বাবা রাতের খাবার পর মাছের চৌবাচ্চার পাশে বসে সিগারেট খান। এবং জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা চৌবাচ্চায় ফেলেন। এই নিয়ে রাগারাগি কম হয় নি।

একা তিনি কতদিক সামলাবেন? মেয়ের বিয়ে যদি শেষপর্যন্ত ঠিক হয়ে যায় তাহলেও বিপদ আছে। বিয়ের পুরো ব্যাপারটা তাঁকে একা সামাল দিতে হবে। ব্যাংকে টাকা যা আছে তাতে বিয়ের খরচ উঠবে না। টাকা ধার করতে হবে। সাভারে তিন কাঠার একটা প্লট কেনা আছে। সেটা বিক্রি করতে হবে। জমি বিক্রি কেনার চেয়ে অনেক কঠিন। এই কঠিন কাজটা তাকেই করতে হবে।

টেলিফোন বাজছে।

এটাই কি সেই বিশেষ টেলিফোন? শায়লা বানুর বুক ধক ধক করছে। তাঁর হাতের কাছেই টেলিফোন, তিনি ধরলেন না। অবহেলার ভঙ্গিতে বললেন, মীরা টেলিফোনটা ধর তো। মীরা তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে। এবার এস.এস.সি. দিয়েছে। তিনি মেয়ে ভাগ্যে ভাগ্যবতী। তার এই মেয়েটা রূপবতী। সবচে বড় কথা এর গায়ের রঙ ভালো। এর বিয়ে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না। শায়লা বানু দুই মেয়ের কথা ভেবে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মেয়েরা তার বাবার রূপ পেয়েছে। মেয়েদের বাবা যৌবনে অসম্ভব রূপবান ছিলেন। শায়লা বানুর বাবা ছেলের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শুধুমাত্র তার আগ্রহেই বিয়েটা হয়। শায়লার বিয়েতে মত ছিল না। বি.এ. পাস একটা ছেলে, চাকরি নেই। পরিবারের অবস্থা ভালো না। তার সঙ্গে কিসের বিয়ে? কিন্তু শায়লার বাবার এক কথা, "আমি আমার জীবনে এত সুন্দর ছেলে দেখি নি। এই ছেলে হাত ছাড়া করা যাবে না। আমার পরিবারের রূপ নেই, এই ছেলে রূপ নিয়ে আসবে।"

শায়লার বাবা তাঁর রূপবান জামাই-এর পরিণতি দেখে যেতে পারেন নি। শায়লার বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি মারা যান। মৃত্যুর সময় তাঁর রূপবান জামাই পাশেই ছিল। অত্যন্ত সুপুরুষ একজন যুবক ছেলের দিকে তাকিয়ে তাঁর আনন্দময় মৃত্যু হয় বলে শায়লার ধারণা।

শায়লা মীরার দিকে তাকিয়ে আছেন। মীরা টেলিফোনে কেমন যেন মাথা নিচু করে কথা বলছে। তার মুখ লালচে দেখাচ্ছে। ভালো লক্ষণ না। প্রেম-প্রেম খেলা না তো? সেরকম কিছু হলে শুরুতেই খেলা বন্ধ করতে হবে। শায়লা বললেন, কার টেলিফোন?

মীরা হাত দিয়ে রিসিভার চেপে ধরে বললেন, আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে। কথা বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে গেল। চোখের দৃষ্টি নেমে গেল।

মেয়েটার নাম কী?

নাম ইতি।

ওদের বাসা কোথায়?

মগবাজারে।

BANGLABOOK.COM

বাবা কী করেন?

কাস্টমসে চাকরি করেন।

শায়লা বানু এতগুলি প্রশ্ন করলেন জানার জন্যে যে মীরা আসলেই কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে নাকি কোনো ছেলের সঙ্গে। ছেলের সঙ্গে কথা বললে এত দ্রুত প্রশ্নের জবাব দিতে পারত না। গণ্ডগোল করে ফেলত। সবচে ভালো হতো যদি তিনি বলতেন, দেখি টেলিফোনটা দে তো। আমি একটু ইতির সঙ্গে কথা বলি। এটা করা ঠিক হবে না। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তবে তিনি যে প্রশ্নগুলি করেছেন সেগুলি কাজে লাগবে। দিন দশেক পর প্রশ্নগুলি আবার তিনি মীরাকে করবেন। ইতিদের বাসা কোথায়? ইতির বাবা কী করেন? ইতি বলে সত্যি যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে মীরা ঠিকঠাক প্রশ্নের জবাব দেবে। আর ইতি কোনো বানানো বান্ধবী হলে উত্তর দিতে গিয়ে জট পাকিয়ে ফেলবে।

মীরা টেলিফোনটা রাখ তো। জরুরি কল আসবে। লাইন বিজি রাখলে চলবে না।

মীরা ঝট করে টেলিফোন রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। শায়লাও বের হলেন। বাগানের ফুলগাছে পানি দেবেন। বাগানবিলাসে শুয়োপোকা হয়েছে। গাছে ওষুধ দেবেন। টেলিফোনটা এর মধ্যে চলে আসার কথা। এখনো আসছে না কেন বুঝতে পারছেন না। তাহলে কি ওরা না বলে দিয়েছে? বড় আপা লজ্জায় পড়ে দুঃসংবাদটা দিচ্ছেন না।

চিত্রা মাছের চৌবাচ্চার কাছে বসে আছে। তাকে খুব-একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে না। সে খুব আগ্রহের সঙ্গে মাছ দেখছে। মা'কে বারান্দায় আসতে দেখেই চিত্রা বলল, মা তোমার জন্যে তিনটা দুঃসংবাদ আছে— একটা ছোট, একটা মাঝারি এবং একটা বড়। কোন দুঃসংবাদটা আগে শুনতে চাও?

শায়লা বিরক্ত গলায় বললেন, যা বলার সহজ-স্বাভাবিকভাবে বলবি। পেঁচিয়ে কথা বলবি না। ছোট-বড়-মাঝারি দুঃসংবাদ আবার কী?

মেজাজ খারাপ কেন মা?

মেজাজ খারাপ না, পেঁচানো কথা শুনলেই আমার রাগ লাগে।

মেজাজ খারাপ থাকলে নরমাল কথা শুনলেও রাগ লাগে। আর যদি মেজাজ ভালো থাকে তাহলে পেঁচানো কথা শুনলেও মনে হয়— বাহ্ সাধারণ কথাকেই

মেয়েটা কি সুন্দর করে পেঁচিয়ে বলছে। আমার মেয়ে প্যাচকুমারী। যা-ই হোক দুঃসংবাদগুলি মানের ক্রমআনুসারে বলছি। সবচে কম দুঃসংবাদ হলো— মাছের চৌবাচ্চায় দু'টা সিগারেটের টুকরা ভাসছে। তার চেয়েও হাইডোজের দুঃসংবাদ হচ্ছে— একটা মাছ মরে ভেসে উঠেছে। এখন শোনো সবচে খারাপ দুঃসংবাদটা। সবচে খারাপ সংবাদ হলো— চিত্রা কথা বলা বন্ধ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

বলে ফেল। চুপ করে আছিস কেন?

দুঃসংবাদ আস্তে আস্তে দিতে হয় এই জন্যে চুপ করে আছি। যা-ই হোক বলে ফেলি— বড়খালা বিয়ের যে খবরটা দেবেন বলেছেন সেই খবরটা হলো— 'না'। ওরা তোমার বড়মেয়ের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড না। সোনারগাঁও হোটেল থেকে আনা চার পাউন্ডের কেকের টাকাটা ওদের পানিতে গেছে।

তুই কী করে জানলি?

যেভাবেই হোক জেনেছি। বড়খালা দুপুরেই খবর পেয়েছেন, খবরটা দিতে তাঁর কষ্ট লাগছে বলে এখনো দিচ্ছেন না।

তুই কখন জেনেছিস?

আমিও তখনই জেনেছি।

কিভাবে জেনেছিস?

চিত্রা হাসিমুখে বলল, মা তুমি ভুলে গেছ যে আমার একটা মোবাইল টেলিফোন আছে।

তোকে কে খবর দিয়েছে?

কে দিয়েছে এটা মোটেই ইম্পর্টেন্ট না। খবরটা কি সেটা ইম্পর্টেন্ট। মা শোনো, মরা মাছটা এখন কী করবে?

শায়লা তিক্ত গলায় বললেন, মরা মাছ আমি কি করব মানে? মরা মাছ মানুষ কী করে?

চিত্রা বলল, রান্না করে খায়, এইটুকু জানি। এই মাছ তুমি নিশ্চয়ই রান্না করবে না।

চিত্রা তুই ঢং করছিস কেন? তোর ঢংটা তো আমি বুঝতে পারছি না। বরপক্ষের ওরা না করেছে, তার জন্যে তোকে ঢং করতে হবে কেন?

তুমি খুবই মন খারাপ করে আছ— তোমার মন খারাপ ভাবটা কমানোর জন্যে ঢং করছি।

শায়লা পানির ঝাড়ি হাতে নিয়ে গাছে পানি দিতে গেলেন। তাঁর রীতিমতো

কান্না পাচ্ছে। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন এই বিয়েটা হবে। বিয়ের পর মেয়ে-জামাই হানিমুন করতে চলে যাবে ইউরোপে। মানুষকে এই খবরটা দেয়াতেও তো আনন্দ। দুঃখী-দুঃখী মুখ করে বলা— মনটা খুব খারাপ। মেয়ে-জামাই হানিমুন করতে ইউরোপ যাচ্ছে। সুইজারল্যান্ডে হানিমুন করবে সেখান থেকে ফ্রান্স আর ইতালি হয়ে দেশে ফিরবে। মেয়েটাকে এতদিন দেখব না ভেবেই কেমন যেন লাগছে। আমি ওদের বললাম, তোরা দেশে হানিমুন কর। দেশে কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে সেখানে যা, কক্সবাজার যা, টেকনাফ যা, কুয়াকাটা যা। সমুদ্র ভালো না লাগলে রাঙ্গামাটি যা, জাফলং যা। দু'জনের মধ্যে ভালোবাসা থাকলে চাঁদপুরও যা সিঙ্গাপুরও তা। এইসব কিছুই বলা যাবে না। সাধারণ কোনো একটা ছেলের সঙ্গে চিত্রার বিয়ে হবে। যে নতুন বউকে নিয়ে রিকশায় শ্বশুর বাড়িতে আসবে। রিকশা ভাড়া কমানোর জন্যে রিকশাওয়ালার সঙ্গে চেঁচামেচি করবে।

চিত্রা মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, মা শুধু-শুধু গাছে পানি দিচ্ছ। আকাশে কি রকম মেঘ করেছে দেখ। এক্ষুণি বৃষ্টি নামবে।

শায়লা জবাব দিলেন না। চিত্রা বলল, মা আমার একটা অনুরোধ রাখবে? প্লিজ। স্কলারশিপের পনেরোশ' টাকা আমার কাছে আছে। চল সবাই মিলে বাইরে খেতে যাই। ফুর্তি করে আসি। তুমি মুখ ভোঁতা করে আছ দেখতে অসহ্য লাগছে।

আমার মাথা ধরেছে আমি কোথাও যাব না।

চিত্রা বলল, মা শোনো ওরা তিনবার করে আমাকে দেখে গিয়ে জানিয়েছে মেয়ে পছন্দ হয় নি। আমি কি পরিমাণ অপমানিত হয়েছি তুমি বুঝতে পারছ না? তুমি মনখারাপ করে আমার অপমানটা আরো বাড়াচ্ছ। হাতমুখ ধুয়ে একটা ভালো শাড়ি পরে চল যাই হৈচৈ করে আসি।

বললাম তো আমার মাথা ধরেছে। তা ছাড়া চাইনিজ-ফুড আমার ভালোও লাগে না।

যাবে না?

না।

চিত্রা চিন্তিত গলায় বলল, মা আরো একটা দুঃসংবাদ আছে। তোমার মাছদের মধ্যে মড়ক লেগেছে, আরেকটা মাছ মারা গেছে। দাড়িওয়ালা একটা গোল্ডফিশ ছিল না! ঐ টা।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। এখনো শায়লা গাছে পানি দিচ্ছেন। ঘরে

টেলিফোন বাজছে— শায়লার তাতে কোনো ভাবান্তর হচ্ছে না। অথচ কিছুক্ষণ আগেই টেলিফোনের শব্দ শুনলেই চমকে উঠছিলেন। মীরা বারান্দায় এসে অবাক হয়ে বলল, মা তুমি বৃষ্টির মধ্যে গাছে পানি দিচ্ছ কেন? শায়লা পানির ঝাঝড়ি নামিয়ে রাখলেন।

মীরা বলল, বড়খালা টেলিফোন করেছেন। তোমাকে চাচ্ছেন।

শায়লা পানির ঝাঝড়ি রেখে উঠে এলেন। একটু সময় পেলে ভালো হতো, মেজাজ ঠিক করা যেত। গলার স্বর শুনে বড়আপা যেন বুঝতে না পারে সে মন খারাপ করেছে।

হ্যালো বড়আপা। কেমন আছ?

ভালো আছি— তোর গলা এরকম শোনাচ্ছে কেন? অসুখ নাকি রে?

ঠাণ্ডা লেগেছে। একটু জ্বর-জ্বরও আছে।

মেয়ের এত বড় শুভসংবাদ আর তুই কিনা মেদামারা হয়ে আছিস!

শায়লার বুকে ধক করে উঠল। মেয়ের এত বড় শুভসংবাদ মানে কী?

হ্যালো, শায়লা এদিকে আমার বিপদটা শোন। আমার সমস্যা তো জানিস। কিছু হলেই নফল নামাজ মানত করে ফেলা। আমি পঞ্চাশ রাকাত নফল নামাজ মানত করেছিলাম। হাঁটুর ব্যথা নিয়ে পঞ্চাশ রাকাত নামাজ পড়া সোজা কথা?

শায়লার মাথা ঝিমঝিম করছে। সংবাদ কি শুভ? তাহলে চিত্রা এসব কি বলল?

চিত্রার বড় খালা হড়বড় করে কথা বলছেন। তাঁর মুখ ভর্তি পান। সব কথা পরিষ্কার বোঝাও যাচ্ছে না। তিনি বললেন— ছেলেপক্ষ কি বলেছে সব তো ডিটেল চিত্রাকে বলেছি। ওরা দু'টার সময় টেলিফোন করেছে। মেয়ে তাদের খুবই পছন্দ। বিয়ের তারিখ করতে চায় সেপ্টেম্বরের সাত। ছেলে বিয়ের পর হানিমুনে যাবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। চিত্রার পাসপোর্ট আছে কি না, না থাকলে ইমিডিয়েটলি করাতে বলল। আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় এনগেজমেন্ট করাতে চায়। কোনো সমস্যা আছে কি না জানতে চাইল। আমি তোর সঙ্গে কথা না-বলেই বলে দিয়েছি সমস্যা নেই। সমস্যা আছে?

না। কিসের সমস্যা।

ওরা দশ-পনেরোজন আসবে। মেয়েকে রিং পরিয়ে দেবে ঐ রিং আবার আসছে ইংল্যান্ড থেকে। চিত্রার আঙুলের মাপ চেয়েছে। কাল সকালের মধ্যেই আঙুলের মাপ লাগবে। তোর মেয়ে রাজকপালী। এখন আল্লাহ-আল্লাহ করে ছোটটাকে পার করতে পারলে তুই একেবারে ঝাড়া হাত-পা। শোন শায়লা, আমি কাল সকালে নিজে এসে আঙুলের মাপ নেব। চিত্রাকে বলে রাখবি যেন আমি না-আসা পর্যন্ত বাইরে না যায়। এই ক'দিন ওর ইউনিভার্সিটি বন্ধ। ও ঘরে বসে থাকবে।

শায়লা টেলিফোন নামিয়ে রেখে মাছের চৌবাচ্চার কাছে গেলেন। দু'টা মাছ মরে ভেসে থাকার কথা। কোনো মাছ মরে ভেসে নেই। শায়লার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। বৃষ্টি ভালোই পড়ছে। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পুরো ভিজে যেতে হবে। চিত্রা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, মা তুমি কি মত পাল্টেছ? আমরা কি আজ বাইরে খেতে যাব?

শায়লা বললেন, হ্যাঁ যাব। তুই মিথ্যা কথাগুলি কেন বললি?

চিত্রা বলল, তুমি এত আপসেট হয়েছিলে দেখে মজা লাগল। তুমি সত্যটা জেনে যাতে অনেক বেশি আনন্দ যাতে পাও সেজন্যেই মিথ্যা বানিয়ে বললাম। মা তুমি তো ভিজে যাচ্ছ। উঠে আস।

শায়লার বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগছে। তাঁর মনে হচ্ছে তিনি কৈশোরে ফিরে গেছেন। তখন তারা থাকতেন ময়মনসিংহে। বৃষ্টি নামলেই বৃষ্টিতে ভেজা ছিল তাঁর প্রধান শখের একটি। ময়মনসিংহ শহর থেকে চলে আসার পর আর ইচ্ছা করে বৃষ্টিতে ভেজা হয় নি।

বৃষ্টি আসার মুখে চিত্রার বাবা নিউমার্কেটের কাঁচাবাজারে ঢুকে পড়লেন। কাঁচাবাজারে ঘুরতে তাঁর ভালো লাগে। প্রথম কিছুক্ষণ তিনি সব্জি দেখেন। কলার থোড় হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন। একটা পাতা উঁচু করে ভেতরটা দেখেন। ফুলগুলি সোনালি আছে কিনা, থোড় কেনার সময় এটাই বিবেচ্য। সজনে ডাটা হাতে নিয়ে দোকানি দেখতে না পায় এমনভাবে পুট করে সজনে ডাটার মাথা ভেঙে গন্ধ শুঁকেন। গাছ থেকে সদ্য পেড়ে আনা ডাটার ঘ্রাণ এক রকম আর সাত দিনের বাসি চিমসে ধরা সজনের ঘ্রাণ অন্য রকম। তাঁর আগ্রহ সবচে বেশি ক্যাপসিকামে। এই সব্জি তিনি আগে কখনো খান নি। মরিচ মরিচ গন্ধ, আবার ঠিক মরিচও না। তিনি কাঁচাবাজারে যখনই ঢুকেন তখনি এই সব্জিটা কিনতে ইচ্ছে করে। পনেরো টাকা পিসের সব্জি কেনা সম্ভব না। তারচেয়েও বড় ভয় শায়লা রাগ করবে। নতুন কিছু নিয়ে গেলেই শায়লা রাগ করে। একবার তিনি এক কেজি মেটে আলু নিয়ে গেলেন। শায়লা বলল, কি এনেছ তুমি। জিনিসটা কি? দেখতে এত কুৎসিত।

তিনি মিনমিনে গলায় বললেন, মেটে আলু।

মেটে আলুর নাম জীবনে শুনি নি। এটা কী বস্তু?

জংলি আলু। চাষ করতে হয় না, বনে বাদাড়ে আপনাতেই হয়। খেতে ভালো।

আমাদের জংলি আলু খেতে হবে কেন? আমরা কি জংলি? উদ্ভট কিছু দেখলেই কিনে ফেলতে হয়? কি এক বস্তু নিয়ে এসেছ— কালো, ছাতা পড়ে আছে। তোমার মেয়েরা তো এই জংলি জিনিস কখনো খাবে না।

আমার জন্যে আলাদা করে একটু রান্না করে দিও।

তোমার জন্যে আলাদা রান্না? একবাড়িতে দু'রকমের রান্না? ভাবতেও খারাপ লাগল না? একজন উর্দি পরা বাবুর্চি রেখে দাও। যে শুধু তোমার রান্না-বান্না করবে। জংলি আলু কিনবে। জংলি মোরগ কিনবে। বাজারে জংলি মোরগ পাওয়া যায় না?

মেটে আলু বাড়িতে রান্না হয় নি। রান্নাঘরের এক কোনায় কিছুদিন আলুগুলি পড়ে রইল। তারপর সেখানেই চারা গজিয়ে গেল। সোনালি এবং সবুজ রঙের গাছ প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়ছে। দেখার মতো দৃশ্য। রহমান সাহেব প্রতিদিন অফিসে যাবার আগে টুক করে রান্নাঘরে ঢুকে দেখে আসতেন। একসময় তিনি বাড়ির পেছনে চারাগুলি পুঁতে দিলেন। গাছ যদি হয় মন্দ কি? গাছের জন্যে আলাদা যত্ন করতে হবে না। জংলি গাছ— এদের যত্ন লাগে না। শায়লার নজরে হয়তো পড়বে না। বাড়ির পেছন দিকে সে যায় না।

আরেকবার তিনি এক ডজন কুমড়ার ফুল নিয়ে এলেন। কুমড়ার ফুল সচরাচর পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও নেতিয়ে থাকা ফুল পাওয়া যায়। সেদিনের ফুলগুলি ছিল টাটকা। মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগেই গাছ থেকে পাড়া হয়েছে। ফুলের বোঁটায় কষ লেগে আছে। শায়লা ফুল দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, ফুল দিয়ে কি করতে হবে? বড়া বানিয়ে খাওয়াতে হবে?

রহমান সাহেব নিচু গলায় বললেন, কুমড়া ফুলের বড়া অতি সুখাদ্য। টাটকা টাটকা ভেজে দিও। তোমার মেয়েরা পছন্দ করবে।

শায়লা বিরক্ত গলায় বললেন, ঘরে বেসন নেই। কেন এইসব যন্ত্রণা কর? ফুল খাওয়ার দরকার কি? ফুল দেখার জিনিস। সেই ফুল খেয়ে ফেলতে হবে কেন? ফুলের বড়া ডুবা তেলে ভাজতে হয়। কি পরিমাণ তেল লাগে সেটা জান? আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি খরচ কমাতে আর তুমি চেষ্টা করছ কিভাবে খরচটা তিনগুণ করা যায়।

রহমান সাহেব বেসন কিনে আনলেন, তেল কিনে আনলেন। এতো আয়োজনের সেই ফুল শেষপর্যন্ত ভাজা হলো না। শায়লা ফুল ধুতে গিয়ে দেখেন ফুলের ভেতর থেকে হলুদ পোকা বের হচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বুয়াকে বললেন— ফুল ফেলে দিয়ে আসতে।

রহমান সাহেব আজ আর সব্জি বাজারে গেলেন না। সরাসরি মাছের এলাকায় চলে এলেন। কত রকমের মাছ সাজানো। দেখতেই ভালো লাগে। মেয়েরা যেমন শাড়ি-গয়নার দোকান ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে— সুন্দর কোনো শাড়ি দেখলেই বলে এই শাড়িটা নামান তো জমিনটা দেখি। রহমান সাহেবও তাই করেন। নতুন কোনো মাছ দেখলেই খুব আনন্দের সঙ্গে মাছ হাতে নেন। রামসোষ মাছের দাড়িতে হাত বুলাতে তাঁর ভালো লাগে। টাটকা বোয়াল, মুখটা লাল— মনে হয় এই মাত্র ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়েছে— মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার মতো দৃশ্য। টাটকা বাছা মাছ দেখে মনে হয় রূপার পাত। কেমন ঝকমক করে।

রহমান সাহেব আজ এসেছেন মাছ কিনতে— দেখতে না। অনেকদিন থেকেই তাঁর একটা ভালো ইলিশ মাছ কেনার শখ। গোল সাইজের মাঝারি ইলিশ। চোখে ঈষৎ লাল রঙের ছোপ। বরিশালের ইলিশ না, পদ্মার ইলিশও না, চাঁদপুরের ইলিশ। পদ্মার ইলিশ খুব সুস্বাদু বলে যে কথাটা প্রচলিত এটা ঠিক না। এখন স্বাদের ইলিশ— চাঁদপুরের ইলিশ।

রহমান সাহেবের বাড়িতে এই মাছটা রান্না হয় না। কারণ চিত্রা ইলিশ মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। গায়ে জ্বর নিয়ে একবার ইলিশ মাছ খেয়ে বমি করেছিল, তারপরই মাছের গন্ধটা তার মাথায় ঢুকে গেছে। সে বলে দিয়েছে যদি ইলিশ মাছ রাঁধতেই হয়, সে যখন বাসায় থাকবে না, তখন যেন রান্না হয়। শায়লা বাড়িতে এই মাছ আনাই বন্ধ করে দিয়েছেন।

সিজনের জিনিস সিজনে খেতে হয়। কমলার সিজনে একটা কমলার কোয়া হলেও মুখে দিতে হয়। জলপাইয়ের সিজনে লবণ মাখিয়ে একটা জলপাই খেতে হয়। বর্ষা হল ইলিশের সিজন। বর্ষায় সর্ষে বাটা দিয়ে একবার ইলিশ না খেলে কিভাবে হয়? তবে ভালো ইলিশ এখন চার-পাঁচশ' টাকার কমে পাওয়া যায় না। আজ এই টাকার ব্যবস্থাটাও হঠাৎ করে হয়ে গিয়েছে। রহমান সাহেব তাঁর অফিসের ড্রয়ারে খুচরা টাকা রাখেন, বেশি না সামান্যই। দু'টাকার কিছু

নোট, পাঁচ-দশ টাকার কয়েকটা নোট। সেখান থেকে সিগারেট কেনার টাকা দিতে গিয়ে দেখেন পাঁচশ টাকার একটা দলা পাকানো নোট। তিনি নিজেই দলা পাকিয়েছেন। (মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে দলা পাকানো তার স্বভাব। মাঝে মাঝেই কাজটা করেন। কেন করেন নিজে জানেন না।) তিনি দলাপাকানো নোট নিয়ে সোজা করে দেখেন একটা পাঁচশ' টাকার নোট। ইলিশ মাছ কেনার চিন্তাটা তখনি তাঁর মাথায় আসে। মাছ কিনতে হবে, সরিষা কিনতে হবে। পুরনো সরিষার ঝাঁঝ বেশি, কিন্তু তিতকুটে ভাব আছে। নতুন সরিষা কিনতে হবে। কাঁচামরিচ কিনতে হবে। রান্নার সময় দেখা যাবে বাসায় কাঁচামরিচ নেই। পুঁই শাকের বড় পাতা পাওয়া গেলে খুব ভালো হয়। ইলিশের পাতুড়ি রান্না করা যায়। তাঁর অতি প্রিয় খাবারের একটি। এক হালি কাগজি লেবুও কেনা দরকার। কাগজি লেবুর সুঘ্রাণ মিশিয়ে পাতুড়ি খাবার আনন্দই অন্য রকম।

BANGLABOOK.COM

সব বাজার সারতে রাত ন'টা বেজে গেল। রহমান সাহেবের মনে হলো— এত রাতে ইলিশ মাছ নিয়ে গেলে রান্না হবে না। শায়লা অবশ্যই মাছটা ফ্রিজে রেখে দেবে। তার সময় সুযোগ অনুসারে ফ্রিজ থেকে বের হবে। রহমান সাহেব ঠিক করলেন তিনি মাছটা নিয়ে তাঁর ছোটবোন ফরিদার বাসায় চলে যাবেন। সে থাকে কলাবাগানে। তার রান্নার হাত খুবই ভালো। তাকে বললেই হবে— তোর জন্যে মাছ এনেছি। তুই তো পাতুড়ি খুব ভালো রান্না করিস। দেখি রান্না কর। সরিষা, কাঁচামরিচ সবই আছে। পুঁই পাতাও এনেছি।

ফরিদা খুব আগ্রহ করে রান্না করবে এবং বলবে— ভাইয়া খেয়ে যাও। না খেয়ে গেলে রান্না করা মাছ আমি নর্দমায় ফেলে দেব। তোমার চোখের সামনেই ফেলব। আমাকে তো তুমি চেন না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, বাড়িতে রান্না করেছে। ওরা না খেয়ে বসে থাকবে। ফরিদা বলবে, থাকুক না খেয়ে বসে। একবেলা বোনের সঙ্গে খেলে ভাবী কি তোমাকে শাস্তি দেবে? কানে ধরে ওঠবোস করাবে? বোনের কথায় না পেরে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজি হবেন। বলবেন, আচ্ছা ঠিক আছে। খেয়েই যাই।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তিনি ফরিদার বাসায় উপস্থিত হলেন। ফরিদা গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলল। তার চোখ মুখ লাল, চুল উসখু-খুসকু। তিনি বললেন, কি হয়েছে রে?

ফরিদা বলল, জ্বর এসেছে। সকাল থেকে বুকে ব্যথা করছে। ওকে বললাম, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। ও বলল ডাক্তারেরা বিকালে চেম্বারে বসে। আমি

সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাব। এখন বাজে সাড়ে ন'টা। সাহেব এখনো ফিরেন নাই।

বুকে ব্যথা কী বেশি?

দুপুরে বেশি ছিল, এখন কম। পানি খেলে ব্যথাটা কমে। চার-পাঁচ বালতি পানি খেয়ে ফেলেছি।

জহির গেছে কোথায়?

মনে হয় তাস খেলতে গেছে। তাসের নেশা হয়েছে, রোজ সন্ধ্যায় বন্ধুর বাসায় তাস খেলতে যায়। আমার ধারণা পয়সা দিয়ে খেলে।

বলিস কী?

ফরিদা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কতরকম যন্ত্রণার মধ্যে যে আছি তোমাকে কি বলব। বলতে লজ্জাও লাগে। ব্যাগে কি মাছ?

রহমান সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুই ইলিশ মাছ ভালো রাঁধিস। তোর জন্যে একটা মাছ নিয়ে এলাম। মাছটা টাটকা— এক্ষুণি রেঁধে ফেল। টাটকা মাছের স্বাদই অন্যরকম।

এখন মাছ রাঁধতে পারব না ভাইয়া। রান্না বান্না আমার মাথায় উঠেছে। কত কিছু যে ঘটেছে তুমি তো জানই না। বাবুর বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। একরাত ছিল হাজতে।

বলিস কী?

রিকশা করে যাচ্ছিল পেছন থেকে একটা প্রাইভেট কার এসে রিকশায় ধাক্কা দেয়। সে রিকশা থেকে নেমে তার স্বভাব মতো গাড়ির ড্রাইভারকে টেনে বের করে চড় থাপ্পড় দেয়। গাড়িটা হলো সরকারি দলের এম.পি'র। এম.পি সাহেবের শালা গাড়িতে বসে ছিল। বুঝতেই তো পারছ এম.পি'র শালা তো সহজ জিনিস না। এদের হম্বিতম্বি হয় মন্ত্রীদের মতো। এম.পি'র শালার কারণে পুলিশ বাবুর বাবাকে এরেস্ট করে হাজতে নিয়ে গেল। জননিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে দিবে এমন অবস্থা। শেষে মন্ত্রী-টন্ত্রী ধরে ছাড়া পেয়েছে। গাড়ির ঐ ড্রাইভারের পায়ে ধরে তাকে মাফ চাইতে হয়েছে। কি লজ্জা বলতো ভাইয়া।

লজ্জা তো বটেই। তোর শরীরটা খারাপ তুই বিশ্রাম কর। আমি উঠি।

চা না খেয়ে যেতে পারবে না। চা খাও।

আরেকদিন এসে খাব।

আচ্ছা ঠিক আছে আরেকদিন এসে খেও— এখন বসতে বলছি বোস। তোমার মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা নাকি হচ্ছে?

জানি না তো।

কি বল জানি না। জানো ঠিকই বলবে না। তোমার কি ধারণা আমাদের বললে আমরা বিয়ে ভাঙিয়ে দেব?

ছিঃ ছিঃ কি বলছিস তুই!

কিছু মনে করো না ভাইয়া। যা বললাম, মনের দুঃখে বললাম। তোমাদের কোনো ব্যাপারেই তো এখন আমরা নেই। বাবুর জন্মদিন করলাম, ভাবীকে, তোমার দুই মেয়েকে আমি নিজে গিয়ে বলে এলাম— তুমি ঠিকই এলে ভাবী এল না। মেয়ে দু'টাকে পাঠাতে পারত, তাও পাঠাল না। হয়তো আমরা তোমার মেয়ের বিয়েতে দাওয়াতও পাব না। বাবুর বাবা গরিব তো! এই জন্যে এত অবহেলা। বড়লোক হতো, পাজেরো গাড়ি থাকত— ঠিকই ভাবী দুই মেয়েকে নিয়ে বাবুর জন্মদিনে আসত। ভাইয়া আমার কথায় রাগ করছ না তো?

না রাগ করছি না।

রাগ করলেও আমার মনের কথা আমি বলবই। নিজের ভাইকে না বললে কাকে বলব? ভাইয়া চিত্রার যে ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে সে নাকি বিরাট মালদার পার্টি। জাহাজের মালিক। বিদেশেই থাকে। হঠাৎ হঠাৎ দেশে আসে।

আমি কিছুই জানি না। ফরিদা আজকে উঠি। আমার শরীরটাও ভালো না।

কী হয়েছে তোমার?

মাঝে মাঝে মাথায় খুব যন্ত্রণা হয়।

তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তোমার শরীর খারাপ। চুল সব পেকে গেছে। তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। ভিটামিন খাও ভাইয়া। বাবুর বাবা রোজ সকালে কি একটা ভিটামিন খায়— ওর স্বাস্থ্য দেখ কত ভালো। এম.পি'র শালার ড্রাইভারকে এক থাপ্পড় দিয়েছিল এতেই ড্রাইভারের গাল বেঁকে গেছে।

রহমান হাসলেন।

ফরিদা রাগী গলায় বলল, তুমি হাসবে না। হাসির কোনো কথা না। আমি ভিটামিন ফাইলটা নিয়ে আসছি। তুমি নিয়ে যাও। ওকে বলব আরেক ফাইল কিনে নিতে।

লাগবে না। তুই নাম বল আমি কিনে নেব।

তুমি জন্মেও কিনবে না। তোমাকে আমি চিনি না। ফাইলটা নিয়ে যাও।

ফরিদা ভিটামিনের ফাইল এনে রহমান সাহেবের হাতে দিতে দিতে বলল, ভাইয়া তুমি এতক্ষণ ছিলে একবারও তো বাবুর খোঁজ করলে না। অথচ এই ছেলে বড়মামা বলতে পাগল।

বাবু ঘুমাচ্ছে নাকি?

না ও গেছে তার চাচার বাসায়। ওদের কম্পিউটার আছে। কম্পিউটারে গেম খেলতে গেছে। বাবুর একটা কম্পিউটারের এত শখ। অথচ এটাই দিতে পারছি না। ঘরে একটা কম্পিউটার থাকলে কত জ্ঞান হয়। ভাইয়া একটু চেষ্টা করে দেখ তো— লোনে কম্পিউটার কেনা যায় কিনা। মাসে মাসে লোন শোধ দিতাম।

আমার তো এরকম পরিচিত কেউ নেই।

তারপরেও একে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ। আমি তো আর তোমাকে কিনে দিতে বলছি না। মানুষের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে উপহার নেয়া আমার স্বভাবের মধ্যে নেই।

রহমান সাহেব বাড়ি ফিরলেন কাক ভেজা হয়ে। বাস থেকে অনেকটা পথ বৃষ্টিতে হাঁটতে হয়েছে। রিকশা ছিল, পাঁচ টাকা ভাড়ার জায়গায় সব রিকশাই চাচ্ছে পনেরো টাকা। একজন চাইল কুড়ি টাকা। তিনি বৃষ্টিতে ভিজেই রওনা হলেন। আষাঢ় মাসের বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা লাগে না, শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে গায়ে কাঁপন ধরে যায়। বাড়ির কাছাকাছি এসে তাঁর মনে হলো জ্বর এসে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত লেগে ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। খুব খিদেও লেগেছে। ইলিশ মাছ গরম গরম ভেজে দিলে এক গামলা ভাত খেয়ে ফেলা যেত।

বাড়িতে কেউ নেই। কাজের বুয়া জইতরীর মা আয়োজন করে টিভি দেখছে। সামনে পানের বাটা। রাহমান সাহেবকে দেখে জইতরীর মা বলল, খালুজান বাড়িত কেউ নাই। রহমান সাহেব বললেন, আচ্ছা।

তারা হেই সইন্ধ্যাকালে গেছে। অখন রাইত বাজে দশটা। টিভির খবরও শেষ।

রহমান সাহেব আবারো বললেন, আচ্ছা।

বাড়িতে কেউ নেই শুনে তিনি শান্তি বোধ করছেন। তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হবে না, কেউ কঠিন গলায় জানতে চাইবে না— বাড়ি ফিরতে এত রাত হলো কেন? বৃষ্টিতে ভেজার দরকার পড়ল কেন?

জইতরীর মা, আজ রান্না কি?

ডিমের সালুন, কুমড়া ভাজি, ডাইল।

ভাত দিয়ে দাও। আমি গোসল করে আসি। পায়ে নোংরা পানি লেগেছে।

গরম পানি দিব খালুজান? চুলাত পানি গরম আছে।

আচ্ছা দাও।

আম্মারার জন্যে চিন্তা লাগতাছে খালুজান। সইন্ধ্যাকালে গেছে অখন বাজে দশটা। দেশের অবস্থা ভাল না।

রহমান সাহেব কিছু বললেন না। তোয়ালে হাতে বাথরুমের দিকে রওনা হলেন। স্ত্রী কন্যাদের জন্যে তাঁর কেন কোনো দুশ্চিন্তা হচ্ছে না, এটা ভেবে সামান্য চিন্তিত বোধ করলেন। তাঁর ইচ্ছা করছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়তে। বৃষ্টির রাতে ঘুমটা আরামের হবে। যদিও ঘুমানো ঠিক হবে না। ওদের ফিরে আসা পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে।

রহমান সাহেব গরম পানি দিয়ে আরাম করে গোসল করলেন। ভাতও খেলেন আরাম করে। তার পকেটে রাখা সিগারেটের প্যাকটা ভিজে ন্যাতা ন্যাতা হয়ে গিয়েছিল— জইতরীর মা চুলার পাশে রেখে সেই ন্যাতা ন্যাতা সিগারেটও ঠিক করে ফেলল। তিনি আরাম করে সিগারেট ধরালেন। তাঁর নিজেকে একজন সুখী মানুষ বলে মনে হতে লাগল। জর্দা দিয়ে একটা পান খেতে পারলে ভালো হতো। অফিসে দুপুরে খাবার পর সব সময় একটা পান খান। কিন্তু এ বাড়িতে পান খাওয়া নিষেধ। শায়লা পান চিবানো দেখতেই পারে না। এ বাড়িতে শুধু জইতরীর মা'র পান খাওয়ার অনুমতি আছে।

খালুজান আফনের টেলিফোন। ছোট আফা টেলিফোন করছে।

রহমান সাহেব ভয়ে ভয়ে টেলিফোন ধরতে গেলেন। বাড়ির কেউ টেলিফোন করছে শুনলেই তার ভয় ভয় লাগে। নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হয়। যেন টেলিফোনে তাঁর কাছে কেউ কৈফিয়ত তলব করবে।

হ্যালো বাবা।

হ্যাঁ।

আমরা বাইরে খেতে এসেছিলাম। সেখান থেকে বড়খালার বাসায় গিয়েছি। বড়খালা ছাড়ছে না। আমরা রাতে এখানে থেকে যাব।

আচ্ছা।

আপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তারিখও হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরের সাত তারিখ— শুক্রবার।

আচ্ছা।

আমরা ভেবেছিলাম ওরা বোধহয় No করে দেবে। তুমি কি ভেবেছিলে ইয়েস না নো।

বিয়ের কথাবার্তা আলাপ আলোচনার কিছুই রহমান সাহেব জানেন না। তারপরেও বললেন— ইয়েস ভেবেছিলাম।

আমিও ইয়েস ভেবেছিলাম। আপাকে কেউ দেখবে আর পছন্দ করবে না এটা হতেই পারে না। বাবা তুমি মা'র সঙ্গে কথা বল।

শায়লা গম্ভীর গলায় বললেন, তুমি কখন বাসায় এসেছ?

রহমান সাহেব মিনমিন করে বললেন, আজ একটু দেরি হয়েছে।

এটা তো নতুন কিছু না। দেরি তো রোজই হচ্ছে। চিত্রা তার স্কলারশিপের টাকায় আজ আমাদের খাওয়াল। তোমাকেও নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তুমি তো রাত দশটার আগে বাসাতেই ফের না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াও কে জানে। ভাত খেয়েছ?

হুঁ।

দরজা ভালো করে বন্ধ করে ঘুমাবে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখবে গ্যাসের চুলা বন্ধ করা হয়েছে কিনা।

আচ্ছা।

মাছের চৌবাচ্চায় সিগারেটের টুকরা ফেলবে না।

আচ্ছা।

প্রতিদিন না করি তারপরেও তো ফেল।

আর ফেলব না।

চিত্রার বিয়ে তো ঠিক হয়ে গেল। এই বৃহস্পতিবারে এনগেজমেন্ট। দয়া করে বাসায় থেকো। ঐ দিন আবার ভাই-বোনদের বাসায় রওনা হয়ো না। তোমার একমাত্র কাজই তো আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বাড়িতে ফকিরের মতো ঘুরে বেড়ানো। চিত্রার এনগেজমেন্টের দিন তুমি অফিসের দু-একজন কলিগকে বলতে চাইলে, বলতে পার। তাই বলে অফিস শুদ্ধ সবাইকে নিয়ে এসো না।

আচ্ছা।

টেলিফোন রাখলাম। চিত্রাকে কিছু বলবে?

না থাক।

মেয়েকে অভিনন্দন দাও। ধর আমি চিত্রাকে দিচ্ছি।

রহমান সাহেব অনেকক্ষণ টেলিফোন ধরে বসে রইলেন। চিত্রা বোধহয় দূরে কোথাও ছিল। রহমান সাহেব কিছুতেই ঠিক করতে পারলেন না মেয়েকে কি বলবেন। "চিত্রা তোমাকে বিয়ে ঠিক হবার কারণে অভিনন্দন" এই ধরনের কথা কি মেয়েকে বলা যায়? এতো মহাবিপদ।

হ্যালো বাবা।

হ্যাঁ।

তোমার একটা চাইনিজ পাওনা রইল। একদিন শুধু তুমি আর আমি চাইনিজ খেয়ে আসব।

কবে?

তুমি যেদিন বলবে সেদিন। তুমি যদি আগামীকাল যেতে চাও। আগামীকালই নিয়ে যাও। যাবে আগামীকাল?

আচ্ছা।

টেলিফোন রাখি বাবা? আর কিছু বলবে?

না।

যাও ঘুমিয়ে পড়।

আচ্ছা।

রহমান সাহেবের খুব আনন্দ লাগছে। জ্বর জ্বর ভাব পুরোপুরি চলে গেছে। জইতরীর মা টিভি দেখছে। তাঁর ইচ্ছা করছে জইতরীর মা'র সঙ্গে বসে টিভি দেখতে।

রহমান সাহেব বললেন, জইতরীর মা তোমার পানের বাটা থেকে একটা পান বানিয়ে দাও তো। আর শোন আগামীকাল রাতে আমার জন্যে কিন্তু রান্না করবে না। আমি বাইরে খাব। আমার দাওয়াত আছে।

জ্বে আচ্ছা। পানে জর্দা দিমু?

হ্যাঁ দাও। বেশি দিও না।

তিনি পান খেলেন। পানের সঙ্গে সিগারেট খেলেন। জইতরীর মা'র সঙ্গে গানের অনুষ্ঠান দেখলেন। ঘুমুতে যাবার আগে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখেন বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় ভেজা বাগানবিলাসের পাতা চকচক করছে। মনে হচ্ছে চাঁদের আলো আঠার মতো গাছের গায়ে লেগে গেছে।

মাছের চৌবাচ্চার পাশে কে যেন বসে আছে। সিগারেট টানছে। সিগারেটের আগুন উঠছে নামছে। তাঁর দিকে পেছন দিয়ে বসেছে বলে তিনি মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। রহমান সাহেব দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলেন। চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়ানো মানুষটা তার পায়ের শব্দ পেয়েই চমকে উঠে দাড়াল।

কে?

চাচাজি আমি মজনু।

ও আচ্ছা তুমি। কি করছ?

কিছু করছি না চাচাজি।

রহমান সাহেব মানুষটাকে চিনতে পারছেন না। তবুও পরিচিত মানুষের মতো কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার ধারণা কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চিনতে পারবেন। তাঁর এই সমস্যা আগে ছিল না। কিছুদিন হলো হচ্ছে। পরিচিত মানুষদেরও চিনতে সময় লাগে। তবে শেষ পর্যন্ত চিনতে পারেন।

ছেলেটাকে এখন চিনলেন। ভাড়াটে নিজাম সাহেবের চাচাতো ভাই। তাদের সঙ্গেই থাকে। বছর দুই আগে চাকরির খোঁজে এসেছিল। চাকরি হয় নি। সে এই বাড়িতেই আছে। নিজাম সাহেবের যাবতীয় কাজকর্ম করে দেয়। বাজার করা, ইলেকট্রিসিটি বিল দেয়া, ঘর মুছে দেয়া— সব কাজেই সে পারদর্শী। রোজই যে ছেলের সঙ্গে দেখা হয় তাকে চিনতে না পারায় রহমান সাহেবের খুবই অবাক লাগল।

তুমি একটু আগে সিগারেট খাচ্ছিলে না?

মজনু জবাব দিল না। মাথা নিচু করে রইল। রহমান সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরাটা তুমি চৌবাচ্চায় ফেলেছ তাই না?

জ্বি।

একটা রহস্যভেদ হলো বুঝলে বাবা, চিত্রার মা'র ধারণা আমি এই চৌবাচ্চায় সিগারেট ফেলতাম। অথচ আমি ফেলতাম না। রোজ সকালে সিগারেটের টুকরা দেখা যেত। তখন আমি কি ভাবতাম জান? আমি ভাবতাম আমিই সিগারেট ফেলে ভুলে যাচ্ছি। ইদানীং আমার ভুলে যাওয়া রোগ হয়েছে। শুরুতে তুমি যে কথাবার্তা বলছিলে— আমি তোমাকে চিনতে পারছিলাম না। তুমি বললে না— তোমার নাম মজনু। আমি ভাবছিলাম, কোন মজনু? বাবা তুমি কি খাওয়া দাওয়া করেছ?

মজনু চুপ করে রইল।

রাত বারটার মতো বাজে। এখনো না খেয়ে আছ। যাও খেয়ে শুয়ে পড়।

মজনু নিচু গলায় বলল, ভাত খাব না চাচাজি।

খাবে না কেন?

ভাইজানের বাসায় যেতে ভয় লাগছে।

কেন?

ভাইজান সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে আমাকে এক জায়গায় পাঠিয়েছিল। টাকাটা হাইজ্যাকাররা নিয়ে গেছে। উনাকে এটা কি ভাবে বলব বুঝতে পারছি না। উনি বিশ্বাস করবেন না। উনি ভাববেন— টাকাটা আমি মেরে দিয়েছি।

তা মনে করবেন কেন?

ভাইজান আমাকে বিশ্বাস করে না। চাচাজি আমি খুবই গরিব কিন্তু এইসব কাজ আমি করি না।

বিশ্বাস না করলে না করবে তাই বলে ভাত না খেয়ে থাকবে নাকি? যাও সব খুলে বল। তারপর খাওয়া দাওয়া কর। তোমাকে তো আর না খাইয়ে রাখবে না।

আচ্ছা যাই। এমন ক্ষিধা লেগেছে চাচাজি। ক্ষিধার চোটে মাথায় বেদনা শুরু হয়েছে। চাচাজি আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন।

অবশ্যই দোয়া করব। অবশ্যই করব।

আমার জন্যে একটা চাকরির চেষ্টাও দেখবেন চাচাজি। আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস। দশ নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিশান পাই নাই। এস.এস.সি.তে ফার্স্ট ডিভিশন ছিল— জেনারেল অংকে লেটার মার্ক ছিল। যে কোনো চাকরি আমি করব চাচাজি— পিওনের চাকরি, দারোয়ানের চাকরি। ক্লাস টু-থ্রির ছাত্রদের প্রাইভেটও পড়াতে পারব। একটু চেষ্টা নিবেন চাচাজি। খুব কষ্টে আছি।

আমি চেষ্টা নিব। যাও খেতে যাও। আজ তোমাদের বাসায় রান্না কি?

গরুর মাংস। দুপুরে গরুর মাংস এনেছিলাম। এরা দুপুরে যা রাঁধে রাতে সেটাই খায়। রাতে ভাত ছাড়া আর কিছু রান্না হয় না। দুপুরে যদি ডাল শেষ হয়ে যায়, রাতে আর ডাল রাঁধবে না। আমি ডাল ছাড়া খেতে পারি না।

রহমান সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আমিও পারি না। আগে সব তরকারির সঙ্গে ডাল খেতাম। চিত্রার মা বলত, সব কিছুর সঙ্গে ডাল মেশালে তরকারির স্বাদ কিভাবে পাবে? এখন সবার শেষে ডাল খাই। অভ্যেস হয়ে গেছে। মানুষ অভ্যেসের দাস।

চাচাজি আমি যাই।

যাও। কোনো দুশ্চিন্তা করবে না।

আমার চাকরির ব্যাপারে একটু মাথায় রাখবেন চাচাজি।

অবশ্যই মাথায় রাখব।

রহমান সাহেবের ঘুম চটে গেছে। তিনি আরো কিছুক্ষণ বারান্দায় হাঁটাহাটি করলেন। মজনুর সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা এটা না জেনে ঘুমুতে যেতেও ইচ্ছা করছে না। বেচারা ডাল ছাড়া খেতে পারে না। ওদের বাড়িতে আবার রাতে রান্না হয় না। দুপুরের ডাল আছে কিনা কে জানে। তার বাড়িতে ডাল আছে। একবাটি ডাল পাঠিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো।

তিনি চৌবাচ্চার পাশে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। শায়লা আজ চৌবাচ্চার

মাছ জারে ভরতে ভুলে গেছে। মাছগুলি মনের আনন্দে ছোটাছুটি করছে। বৃষ্টির পানি পেয়ে তাদের বোধহয় ভালো লাগছে। চৌবাচ্চায় চাঁদের প্রতিবিম্ব। চট করে চোখে পড়ে না। মাথা এদিক ওদিক করতে হয়। রহমান সাহেব মাথা এদিক ওদিক করে চাঁদ দেখতে লাগলেন। এই সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল, বড় একটা মাছ পানির ভেতর থেকে মুখ বের করে খুবই ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, "আজ আমাদের খাবার দেয়া হয় নি।"

রহমান সাহেবের গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ঘটনা কি? মাছ কেন মানুষের মতো কথা বলবে? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? মাথা খারাপ হয়ে গেলে তো সর্বনাশ। চাকরি চলে যাবে। এরা তাকে কোনো পাগলাগারদে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসবে। পাগলদের সঙ্গে থেকে থেকেই তাঁর মাথা আরো খারাপ হবে। তিনি চৌবাচ্চার দিকে আবারো তাকালেন। বড় মাছটা মুখ বের করে ঠোঁট নাড়ছে তবে এখন আর কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। শুধু বিজবিজ শব্দ হচ্ছে। রহমান সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, আল্লাহ রহম কর গো। রহম কর।

মেয়ের এনগেজমেন্ট উপলক্ষে শায়লা অফিস থেকে চার দিনের ছুটি নিয়েছেন। অফিস থেকে ছুটি তিনি এর আগেও নিয়েছেন, কিন্তু এবারে ছুটির দরখাস্ত লিখতে যে আনন্দ পেয়েছেন সে আনন্দ কখনো পান নি।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, বিয়ে দেবার মতো বড় মেয়ে আপনার আছে তাই তো জানতাম না! আপনাকে দেখেই কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী মনে হয়। ছেলে কি করে?

BANGLABOOK.COM

শায়লা গভীর আনন্দের সঙ্গে বললেন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।

ডিরেক্টর সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ভালো ছেলে পেয়েছেন তো! প্রেমের বিয়ে নাকি?

জ্বি না। আমার মেয়েরা প্রেম করা টাইপ না। ঘরোয়া ধরনের মেয়ে।

ছেলের বাবা কি করেন?

চাটার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। ছেলের দাদাকে আপনি হয়তো চিনবেন। সাবিহউল্লাহ খান। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের আমলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।

বাহবা বড় গাছে দড়ি বেঁধেছেন। ভেরি গুড।

স্যার আমি খুবই খুশি হবো যদি মেয়ের এনগেজমেন্টের দিন উপস্থিত থাকেন। আমার তো তেমন কেউ নেই। ছেলে পক্ষ হলো জাহাজ আর আমরা কাগজের নৌকা।

যাব, আমি অবশ্যই যাব। বিয়ে হচ্ছে কবে?

সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে। ছেলের আত্মীয়স্বজন বেশির ভাগই থাকে দেশের বাইরে। বড় ছেলের বিয়ে আত্মীয়স্বজন সবাই আসবে। এই জন্যেই সময় নিচ্ছে।

ভালো সংবাদ খুবই ভালো সংবাদ।

শায়লা চার দিনের ছুটি নিয়েছেন এই খবর শুনে চিত্রা হাসতে হাসতে বলল,

চার দিন তুমি ঘরে বসে থেকে কী করবে? তোমার কাজ কী?

শায়লা অবাক হয়ে বললেন, কি বলিস তুই! আমার কোনো কাজ নেই?

না নেই। ওরা আসবে চা-টা খেয়ে চলে যাবে। তার জন্যে চার দিন ছুটি নিলে? চায়ের সঙ্গে নাশতা কি তৈরি করবে সেটা চিন্তা করার জন্যে দু'দিন আর নাশতা বানানোর জন্যে দু'দিন?

শায়লা বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই বোকার মতো কথা বলবি না। মাথার ঘায়ে আমার কুত্তা পাগলের মতো অবস্থা। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাব কিনা সেটা পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। পুরো সপ্তাহটাই ছুটি নেয়া উচিত ছিল।

প্লিজ বল তো— এত কি তোমার কাজ।

শায়লা মেয়ের সামনে থেকে উঠে গেলেন। মেয়েকে কাজ বলার মতো সময় তাঁর নেই। এনগেজমেন্টের দিন পরার জন্যে শাড়ি কিনতে হবে। একসেট হালকা গয়না বানিয়ে দেবেন। খাবার-দাবার কিছু ঘরে করা হবে। কিছু বাইরে থেকে কেনা হবে। এটাও ঠিক করতে হবে। এদিকে চিত্রার উত্তরার খালা টেলিফোন করে বলেছেন একজন কাজির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। অনেক সময় এ রকম হয় এনগেজমেন্টের পর বর পক্ষের কোনো মুরুব্বি বলে বসেন— বিয়ে পড়ানো হয়ে যাক। তখন তাদের মুখের ওপর না করা যায় না।

এনগেজমেন্টের দিন বরকে কি দেয়া হবে বা দেয়া হবে না সেটা নিয়েও আলোচনার দরকার। ছেলে তাঁকে সালাম করবে তখন একটা আংটি তো তাকে পরাতে হবে। পনেরোশ' টাকা দামের সস্তার আংটি কিনলে চলবে না। ওদের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে আংটি কিনতে হবে। বড় গাছে নৌকা বাঁধার সুবিধা যেমন আছে অসুবিধাও আছে। নৌকা যত ছোট অসুবিধা তত বেশি।

এদিকে কাকতালীয় ভাবে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। গত মাসে টিভি থেকে চিত্রা গান গাওয়ার প্রোগ্রাম পেয়েছিল। সেই গান রেকর্ড করা হয়েছে। প্রচার হয়নি। গানটা প্রচার হবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছ'টায়।

এরচে ভালো সংবাদ আর কি হতে পারে? বরপক্ষের আসার কথা চারটায়। ওরা নিশ্চয় সময়মতো আসবে না। আসতে আসতে পাঁচটা বাজবে। কথাবার্তা বলা, নাশতা খাওয়া, এতে ছ'টা বেজে যাবে। তখন হঠাৎ শায়লা চমকে উঠে বলবেন, আশ্চর্য ভুলেই তো গেছি আজ টিভিতে চিত্রার প্রোগ্রাম আছে। এই তোরা কেউ টিভিটা ছাড় না।

বাসার টিভিটা খারাপ। মাঝে মাঝে রঙ চলে যায়। টিভি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট হয়ে যায়। উত্তরার বড় আপার টিভিটা এনে রাখতে হবে। তবে মেয়ের গান নিয়ে

আদিখ্যাতা করা যাবে না। গানের মাঝখানে শায়লা উঠে যাবেন নিজের জন্যে চা বানিয়ে আনতে। চা নিয়ে ঢুকবেন গান শেষ হবার পর এবং বলবেন, গান শেষ হয়ে গেল নাকি? যেন টিভিতে গান গাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

গানের অনুষ্ঠানের পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই গান প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হবে। তখন শায়লা বলবেন— ক্যাসেট কোম্পানিগুলি গানের ক্যাসেট বের করতে চায়। আমি রাজি না। মেয়ে তো একেবারেই রাজি না। তার কাছে গান হলো খুবই পার্সোনাল ব্যাপার। নিজের আনন্দের জন্যে গান করা। ক্যাসেটে গান বের করা মানে— মানুষের ঘরে ঘরে তার গলার স্বর পৌঁছে দেয়া— এটা নাকি চিত্রার ভালো লাগে না। আমি অবশ্যি এসব কিছু ভাবি না। তারপরেও কেন জানি ক্যাসেট বের করা আমার ভালো লাগে না।

চিত্রার কিছু বান্ধবীকে খবর দেয়া দরকার। যে কোনো উৎসবে মেয়েরা সেজেগুজে কলকল করতে থাকলেই উৎসবটা জমে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কোনো মেয়েকেই যেন চিত্রার চেয়ে সুন্দরী না দেখায়। তখন সবার চোখ গিয়ে পড়বে ঐ মেয়ের দিকে।

কোনো একটা পার্লার থেকে চিত্রার চুলও সেট করে আনতে হবে। খুব সিম্পল ধরনের সেটিং। জবরজং দেখালে চলবে না, আবার ঘরে বসে হাত খোঁপা করে ফেলেছে এরকম মনে হলেও চলবে না।

কত সমস্যা। শায়লা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তবে এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আনন্দ মিশে রইল।

রহমান সাহেবকে অফিসে আজ একটু অস্থির দেখাচ্ছে। এগারটা বাজে নি এর মধ্যে তিনবার চা খেয়েছেন, দু'বার জর্দা দিয়ে পান খেয়েছেন। চার খিলি পান আনিয়ে রেখেছেন। ইচ্ছা হলে খাবেন।

অফিসে কারো সঙ্গে তাঁর তেমন সদ্ভাব নেই। তবে অফিসের বেয়ারা রতনকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। সে যখন চা বা পান নিয়ে আসে তার সঙ্গে তিনি সংসারের কিছু টুকিটাকি কথা বলেন। আজ রাতে তিনি বড় মেয়ের সঙ্গে চাইনিজ হোটেলে খেতে যাবেন এই কথা রতনকে বলেছেন। গলা নিচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলেছেন—

হোটেলের খাওয়া আমার খুবই অপছন্দ। বড় মেয়েটা একটা শখ করেছে এই জন্যে যাওয়া। ছেলেমেয়েদের শখের দিকটা বাবা মা'কে দেখতে হয়।

রতন বেশির ভাগ সময়ই আলাপ-আলোচনায় অংশ নেয় না। তবে এমন ভাবে কথা শুনে যে মনে হয় খুব আগ্রহ নিয়ে কথা শুনছে। রহমান সাহেব ঠিক করেছেন অফিস ছুটির পর রতনকে কাল রাতে মাছের ব্যাপারটা বলবেন। কি ভাবে মাছটা তাকে বলল, আজ আমাদের খাবার দেয়া হয় নি। সে অবিশ্বাস করবে না, অন্য কাউকে বলেও বেড়াবে না। অফিস ছুটির পরও রহমান সাহেব বেশ কিছুক্ষণ থাকেন। ফাঁকা অফিসে কিছুক্ষণ একা বসে থাকতে তাঁর ভালো লাগে। তখন রতন তার জন্যে লেবু চা নিয়ে আসে। এই চায়ের দাম রতন কখনোই তাকে দিতে দেয় না। রহমান সাহেবের ইচ্ছা করছে মেয়ের এনগেজমেন্টে রতনকে দাওয়াত করতে। শায়লা তো বলেছে অফিসের কোনো কলিগকে বলতে ইচ্ছা করলে তিনি বলতে পারেন। তবে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে রতন একজন পিওন তাহলে সমস্যা হতে পারে। রতন যদি ভালোমতো সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে যায় তাহলে তাকে পিওন মনে হবে না। রতনকে তিনি দাওয়াতের কথা কিছু বলেন নি শুধু বলে রেখেছেন— "বৃহস্পতিবারটা খালি রেখ। এক জায়গায় যেতে হতে পারে।" রতন ঘাড় কাত করেছে। কোথায় যেতে হবে, কি ব্যাপার কিছুই জিজ্ঞেস করে নি।

লাঞ্চের মিনিট দশেক আগে রহমান সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার। লাঞ্চের সময় বড় সাহেব বাসায় লাঞ্চ করতে যান। বেশির ভাগ সময়ই ফেরেন না।

এই অফিসের সবাই বড় সাহেবের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। তবে তিনি ভয় পান না। তিনি যথাসময়ে অফিসে আসেন, মন লাগিয়ে কাজ করেন, যথা সময়েরও পরে অফিস থেকে বাড়িতে যান। গত পাঁচ বছরে একদিনের জন্যেও ছুটি নেন নি। তাঁর টেবিলে কোনো পেন্ডিং ফাইল নেই। তাঁর ভয় পাওয়ার কি আছে? তবে বড় সাহেবের চেহারা রাগী রাগী, গলার স্বরও রাগী। তিনি বড় সাহেবকে এমন কিছু বলতে যাচ্ছেন না যে বড় সাহেব রাগ করবেন এবং রাগী স্বর বের করবেন।

বড় সাহেব টেলিফোনে কথা বলছিলেন। পর্দা সরিয়ে এই দৃশ্য দেখে রহমান সাহেব ঠিক করতে পারলেন না, ঘরে ঢুকবেন নাকি ঢুকবেন না। কেউ টেলিফোনে কথা বললে হুট করে ঘরে ঢুকে পড়া ঠিক না। টেলিফোনে লোকজন অন্তরঙ্গ কথা বলে। বড় সাহেব হাতের ইশারায় রহমান সাহেবকে ঘরে ঢুকতে বললেন— এবং ইশারা করলেন চেয়ারে বসার জন্যে। এটা একটা বিশেষ ভদ্রতা। বড় সাহেবের চেয়ে অনেক নিচের অফিসার সেকশনাল ইনচার্জ পরিমল বাবু এই ভদ্রতা করেন না। তাঁর ঘরে ঢুকলে তিনি বসতে বলেন না। কেউ বসে পড়লে বিরক্ত হয়ে

তাকান। বড় সাহেব টেলিফোন কানে রেখেই রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ব্যাপার?

রহমান সাহেব বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, স্যার আপনার কথা শেষ হোক তারপর বলি? এক সঙ্গে দুইজনের কথা শোনা মুশকিল।

বড় সাহেবের ভুরু কুঁচকে গেল। মুখের মধ্যে রাগ রাগ ভাব চলে এল। রাগ করার মতো কোনো কথা রহমান সাহেব বলেছেন কি না বুঝতে পারলেন না। বড় সাহেব টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রেখে শুকনা মুখে বললেন, টেলিফোন নামালাম, এখন বলুন কি ব্যাপার।

রহমান সাহেব বললেন, একটা চাকরির ব্যাপারে এসেছি স্যার।

বড় সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কি চাকরি?

একটা ছেলে স্যার। খুবই বিপদগ্রস্ত। অতি ভালো ছেলে। মেট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে, অংকে লেটার ছিল। ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট সামান্য খারাপ হয়েছে, দশ নম্বরের জন্যে ফার্স্ট ডিভিশন পায় নাই।

বড় সাহেব কথার মাঝখানেই বললেন, হোল্ড সেকেন্ড। আমরা কি চাকরির জন্য কোনো বিজ্ঞাপন দিয়েছি?

জ্বি না স্যার।

তাহলে আমাকে চাকরির কথা বলছেন কেন?

স্যার ছেলেটা আমাকেই চাকরির কথা বলেছে। আমি চাকরি কোথায় পাব? আপনারা বড় মানুষ, আপনাদের কত যোগোযোগ। যে কোনো চাকরি পেলেই চলবে— পিওন, দারোয়ান, টি বয়...

নাম কি ছেলের?

নামটা স্যার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। মনে পড়লেই আপনাকে জানাব।

যে ছেলের চাকরির জন্যে সুপারিশ করছেন তার নামই মনে নেই! ছেলে কি আপনার আত্মীয়?

জ্বি না ভাড়াটের চাচাতো ভাই। স্যার ছেলেটা খুবই কষ্টে আছে একটু দেখবেন। ক্লাস টু-থ্রি পর্যন্ত ছেলেমেয়েকে সে প্রাইভেটও পড়াতে পারবে।

বড় সাহেব কিছু বললেন না। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। রহমান সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, নামটা মনে পড়লেই আপনাকে জানিয়ে দিব। ইনশাল্লাহ আজ দিনের মধ্যেই জানাব।

ইমার্জেন্সি কিছু নেই। আজ দিনেই যে জানাতে হবে তা না।

রহমান সাহেব নিজের সিটে ফিরে ড্রয়ারটা খুলতেই নাম মনে পড়ল— মজনু।

লাইলী মজনুর মজনু। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে গেলেন। বড় সাহেবও লাঞ্চের জন্যে বের হচ্ছিলেন। তাকে নামটা জানিয়ে দিলেন। নামটা মনে পড়ছে স্যার। মজনু। লাইলী মজনুর মজনু। বড় সাহেব কিছু বললেন না। তবে তাঁকে দেখে মনে হল তিনি রহমান সাহেবের কথাবার্তায় একধরনের মজা পাচ্ছেন।

অফিস ছুটির পর রতন রং চা নিয়ে এল। রহমান সাহেব বললেন, আজ একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। মেয়ে বাইরে খেতে নিয়ে যাবে, লন্ড্রি থেকে কাপড় আনতে হবে। গতকালের মতো ঝড় বৃষ্টি না হলেই হয়। বেচারী আশা করে আছে আমাকে নিয়ে যাবে— ঝড় বৃষ্টি হলে তো যেতে পারবে না। যাদের গাড়ি আছে তাদের অবশ্য কোনো সমস্যা নেই। ঝড় বৃষ্টি হলেই বরং তাদের সুবিধা। বৃষ্টি দেখতে দেখতে গাড়ি করে যাওয়া। কথা ঠিক বলেছি না রতন?

জ্বি।

তোমাকে কোনো একদিন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলব। মাছের বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। আজই বলতাম, কিন্তু আমার আবার সকাল সকাল বাড়িতে ফেরা দরকার। কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে এটা আমি চাই না। আমি সবার জন্যে অপেক্ষা করব, কিন্তু আমার জন্যে কেউ যেন অপেক্ষা না করে। এটা ভালো বুদ্ধি না?

জ্বি।

তোমাকে যে ঘটনাটা বলব এটা গতকাল রাত আনুমানিক এগারোটার সময় ঘটেছে। আমার স্ত্রী চৌবাচ্চায় গোল্ডফিশ পুষে। সেই গোল্ডফিশ নিয়ে একটা ঘটনা। কাল পরশু যে কোনো একদিন বলব। আমি যদি ভুলে যাই তুমি মনে করিয়ে দিও।

জ্বি আচ্ছা।

আর বৃহস্পতিবারটা ফ্রি রেখ। তোমার এক জায়গায় দাওয়াত। দাওয়াতটা ক্যানসেলও হয়ে যেতে পারে। ক্যানসেল হলে মনে কষ্ট নিও না।

জ্বি আচ্ছা।

সন্ধ্যার আগেই রহমান সাহেব বাড়ি ফিরলেন। চিত্রা বাড়িতে নেই, মা'র সঙ্গে শাড়ি কিনতে গিয়েছে। বিকেলে গিয়েছে এখনো ফিরে নি। রহমান সাহেব ধোপার দোকান থেকে পাঞ্জাবি ইস্ত্রী করে আনলেন। মেয়ে বাড়ি ফেরার আগেই তৈরি হয়ে থাকবেন যেন তাঁর কারণে দেরি না হয়।

মীরা বলল, বাবা তুমি এমন সেজেগুজে বসে আছ কেন? দেখে মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছ।

রহমান সাহেব জবাব দিলেন না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। রাতে বাইরে খেতে যাওয়ার কথা মীরাকে বলতে পারতেন। বললেন না, কারণ মীরা খেতে যাচ্ছে না। শুধু তিনি আর চিত্রা। এতে মীরা মনে কষ্ট পেতে পারে। অল্পবয়েসী মেয়েরা খুব সহজেই কষ্ট পায়।

মীরা বলল, যত দিন যাচ্ছে তুমি যে ততই বদলে যাচ্ছ এটা কি জান!' মাঝে মাঝে তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি আমাদের চিনতে পারছ না। মনে হয় তুমি এ বাড়ির কেউ না। তুমি একটা ফার্নিচার। আপার বিয়ে হচ্ছে এত হৈচৈ, তুমি কিন্তু নির্বিকার। উত্তেজনায় মা রাতে ঘুমুতে পারছে না। তাঁকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুতে হচ্ছে। আর তুমি দিব্যি নিজের মতো আছ। যে ছেলের সঙ্গে আপার বিয়ে হচ্ছে তুমি তার নাম পর্যন্ত জান না।

নাম জানব না কেন? নাম জানি।

বল নাম বল।

রহমান সাহেব বিপদে পড়ে গেলেন। তিনি নাম মনে করতে পারছেন না। তাঁর মনে ক্ষীণ সন্দেহ হলো— নামটা তাঁকে বলাই হয় নি। নাম মনে করার চেষ্টা করতেই একটা নাম তাঁর মনে পড়ল লাইলী মজনুর, মজনু। কিন্তু মজনু ছেলেটার নাম না।

কি চুপ করে আছ কেন? নাম বল।

ভুলে গেছি। আমার কিছু একটা হয়েছে। নাম মনে করতে পারি না। ঐ দিন অফিসে বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলছি— বড়সাহেব নাম জানতে চাইলেন। আর তো দেখি নাম মনে পড়ে না। কিছুক্ষণ পরে মনে পড়েছে।

তোমার ধারণা আপার বরের নাম তোমার কিছুক্ষণ পরে মনে পড়বে?

হুঁ।

মনে পড়লে তো ভালোই। আমাকে জানিও। আর যদি মনে না পড়ে সেটাও আমাকে জানিও। মা তোমাকে ধরবে।

আমাকে ধরবে কেন?

এতক্ষণ যে আমি তোমাকে ধরলাম— সবই মা'র কথা। মা বলেই রেখেছে আজ তোমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে তুমি কিছু জান কিনা।

রহমান সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, ছেলের নাম বল। মনে করে রাখি।

ছেলের নাম আহসান খান। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। ছেলের বাবা জামালউদ্দিন

খান। চাটার্ড একাউন্টেন্ট। এখন উনার নানার ব্যবসা আছে। আলফা গ্রুপ অব ইন্ডস্ট্রিজের উনি মালিক। ছেলের দাদা সাবিহউল্লাহ খান সোহারওয়ার্দির আমলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। মনে থাকবে?

একটা কাগজে লিখে দে। এত কিছু কি ভাবে মনে থাকবে?

সেটাই ভালো। লিখে দিচ্ছি। তুমি বসে বসে মুখস্থ কর। আজ তোমার মহাবিপদ। মা তোমার ওপর খুব রেগে আছে।

কেন?

কেন তা যথাসময়ে জানবে এবং আমি মা'র সঙ্গে একমত। তোমার ওপর রাগ করার কারণ মা'র আছে।

রাত ন'টা বেজে গেছে চিত্রা তার মা'কে নিয়ে এখনো ফেরে নি। রহমান সাহেবের ক্ষিধেয় নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে। তিনি একটু চিন্তিতও বোধ করছেন। আরো দেরি করলে তো রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। তার সময় কাটছে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কোনো কিছুই ভালো লাগে না। খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করলেন। খবরের কাগজ পড়তে তাঁর সব সময়ই ভালো লাগে। সকালবেলা যে কাগজ পড়েন, সন্ধ্যাবেলাও সেই একই কাগজ পড়তে পারেন। সকালবেলায় তিনি কি পড়েছেন, সন্ধ্যাবেলায় তা তাঁর পরিষ্কার মনে থাকে না। মীরা কাগজে যে সব তথ্য দিয়ে গেছে, সেগুলি তিনি ভালো মতো মুখস্থ করে রেখেছেন। শায়লা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তাকে আটকাতে পারবে না। মীরা যে তাকে ঝামেলা থেকে বাঁচানোর জন্যে এত কিছু করবে তিনি ভাবতেই পারেন নি। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে এ রকম একটা মেয়ে থাকা যে কোনো বাবার জন্যেই ভাগ্যের ব্যাপার।

চিত্রা ফিরল রাত সাড়ে ন'টায়। ফিরেই সাবান তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। শায়লা বললেন, ভাত খেয়ে গোসলে যা। তোর গোসল তো এক ঘন্টার মামলা। এদিকে ক্ষিধেয় মারা যাচ্ছি।

চিত্রা বলল, গা ঘিন ঘিন করছে। গোসল না করে খেতে পারব না।

শায়লা রহমান সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি সেজেগুজে বসে আছ কেন? কোথাও যাচ্ছ?

রহমান সাহেব ভীত গলায় বললেন, না।

তোমার বোনের বাসা থেকে ঘুরে আস না কেন? বোনের বাসায় চলে যাও।

কেন?

তোমার বোন আজ দুপুরে এ বাড়িতে এসেছিল। হাতে একটা আইসক্রিমের প্লাস্টিকের বাটি। বাটিতে দুই পিস ইলিশ মাছ। তুমি নাকি মাছ কিনে দিয়ে

এসেছিলে। মাছ, সরিষা, কাঁচা মরিচ। তুমি যে ভাইবোনদের বাড়িতে বাজার করে দাও। তা তো জানতাম না।

রহমান সাহেব কিছু বললেন না। তিনি এমনিতেই ক্ষিধেয় অস্থির হয়ে ছিলেন। দুই পিস ইলিশ মাছের কথা শুনে ক্ষিধে আরো বেড়ে গেল।

শায়লা বললেন, তুমি নাকি তোমার বোনের ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দিচ্ছ?

রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কই না তো।

নিশ্চয়ই এ জাতীয় কথা বলছ— তোমার বোন তো বানিয়ে কথা বলছে না। কম্পিউটার নিয়ে তোমার বোনের সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়েছে, না হয় নি।

হয়েছে।

BANGLABOOK.COM

এই তো থলের বেড়াল বের হয়ে যাচ্ছে। বোনের ছেলেকে তুমি উপহার অবশ্যই দেবে। সেটা দেবে তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী। কম্পিউটার কেনার সামর্থ্য কি তোমার আছে?

না নেই।

এক কাজ কর, রাত এমন কিছু বেশি হয় নি। তুমি তোমার বোনের বাসায় যাও। তাকে বুঝিয়ে বলে এসো— কম্পিউটার উপহার দেবার সামর্থ্য তোমার নেই। উপহার দিবে বলেছিলে, কিন্তু দিতে পারছ না।

এখনই যাব?

হ্যাঁ এখনি যাবে। তোমার বোনের দিয়ে যাওয়া ইলিশ মাছ আমি গরম করে রাখব। ফিরে এসে আরাম করে খাবে। বসে আছ কেন? উঠ। রহমান সাহেব উঠলেন। দিশাহারার মতো এগুলেন দরজার দিকে। শায়লা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। আজ যাওয়া বাদ দাও। কাল অফিস ফেরত অবশ্যই বোনের কাছে যাবে। তাকে ভালোমতো বুঝিয়ে বলবে।

রহমান সাহেব ঘাড় কাত করলেন। তাঁর বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে।

শায়লার মেজাজ খুবই খারাপ। এত যন্ত্রণা করে তিনি যে শাড়ি কিনেছেন— বাসায় এসে সেই শাড়ির রঙ তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। শাড়ির জমিনে হলুদ এবং সোনালির মাঝামাঝি রঙ। সেই রঙ এখন কেমন যেন ময়লা দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে পুরনো শাড়ি। আঁচলের সবুজ কাজটাও ভালো লাগছে না। হিজিবিজি লাগছে।

তাঁর মেজাজ খারাপের আরো একটি কারণ হল, বাসায় পা দিয়েই তিনি দেখেছেন মীরা টেলিফোন করছে। মা'কে দেখেই সে তড়িঘড়ি করে টেলিফোন নামিয়ে রেখে দ্রুত অন্য ঘরে চলে গেল। লক্ষণ মোটেই ভালো না। প্রেমের চারাগাছ শুরুতেই উপড়ে ফেলতে হবে। চারাগাছ উপড়ানোর কাজটা তিনি রাতে ঘুমুবার আগে আগে করবেন ভেবে রেখেছিলেন। এখন মত পাল্টালেন। কোনো কিছুই ফেলে রাখতে নেই। যখনকার কাজ তখন করতে হয়। তিনি মীরার ঘরে ঢুকে বললেন, মীরা খেয়েছিস?

মীরা বলল, না। রাতে খাব না।

খাবি না কেন?

তরকারি পছন্দ না। টেংরা মাছের ঝোল রেঁধেছে। টেংরা মাছ আমার দু' চক্ষের বিষ।

ডিম ভেজে দিতে বল। ডিম ভাজা দিয়ে খা।

মীরা বলল, আচ্ছা।

শায়লা মেয়ের খাটে বসতে বসতে বললেন, ইতিদের বাসা কোথায় রে?

মীরা অবাক হয়ে বলল, কোন ইতি?

তোদের সঙ্গে পড়ে যে মেয়ে।

ওর বাসা কোথায় আমি কি করে জানব?

ইতির বাবা কি করেন?

আমি জানি না মা ইতির বাবা কি করেন।

শায়লা অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

মীরা বলল, কি হয়েছে মা, এরকম করে তাকালে কেন?

শায়লা বললেন, আয় খেতে আয়। মীরার চোখে ভয়ের ছায়া। ইতি প্রসঙ্গ তার এখন মনে পড়েছে।

টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা হয়?

মীরা চুপ করে রইল। শায়লা বললেন, ভাত খেয়ে তুই আমার ঘরে আসবি। কি ঘটনা আমাকে বলবি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলবি। ছেলের নাম, কোথায় প্রথম দেখা সব।

মীরা ক্ষীণ স্বরে বলল, শুধু টেলিফোনে কথা হয় মা। আর কিছু না।

দেখা হয় নি এখনো?

না।

না দেখেই প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিস? প্রেম এত সস্তা? টেলিফোনে গলার স্বর শুনে প্রেম?

প্রেম না মা।

প্রেম না তো কি?

কথা বলতে ভালো লাগে। তাই কথা বলি।

রোজ কথা হয়?

হ্যাঁ।

BANGLABOOK.COM

ছেলের টেলিফোন নাম্বার কি?

টেলিফোন নাম্বার আমি জানি না মা, আমি টেলিফোন করি না সে করে।

টেলিফোনে অশ্লীল কথা বলে?

না তো। অশ্লীল কথা বলবে কেন?

বলবে কি-না সেটা তো আমি জানি না। বলে কি-না সেটা বল।

না বলে না।

তুই কখনো ছেলেকে দেখতে চাস এমন কথা বলিস নি? বলিস নি যে আমি নিউ মার্কেটে যাচ্ছি অমুক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব। শাড়ি পরে যাব— শাড়ির কালার এই— এমন কথা বলিস নি। ঠিক মতো জবাব দে।

বলেছি।

সে দেখা করতে রাজি হয় নি?

না।

টেলিফোনটা আসে কখন? আমি যখন বাড়িতে থাকি না তখন?

হ্যাঁ।

যে ছেলে তোকে টেলিফোন করছে সে খুব ভালো করে জানে আমি কখন বাড়িতে থাকি, কখন থাকি না। তোর সঙ্গে দেখা করছে না ভয়ে। দেখা হলে তোর প্রেম চলে যাবে এই ভয়। আমার ধারণা— মজনু হারামজাদাটা এই কাজ করছে। তুই তো বোকার হদ্দ, বুঝতে না পেরে প্রেমে গড়াগড়ি খাচ্ছিস। ছেলেটা কে তোকে বলে দিলাম। এখন কায়দা করে বের কর। তারপর দেখ আমি ঐ ছোঁড়াকে কি করি। প্রথমে মা ডেকে তোর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে তারপর অন্য কথা। কত বড় সাহস। নাম মজনু টেলিফোনে লাইলী যোগাড় করে ফেলেছে। আয় ভাত খেতে আয়।

মীরা বাধ্য মেয়ের মতো ভাত খেতে গেল। মা'কে খুশি করার জন্যে তার অতি অপছন্দের টেংরা মাছ চার পাঁচটা খেয়ে ফেলল। মীরা ভেবে ছিল খাওয়ার পর মা দ্বিতীয় অধিবেশন বসাবেন। কবে প্রথম কথা হয়েছিল। কি কি কথা সব জানতে চাইবেন। তা হলো না। শায়লার মাথা ধরেছে। তিনি রাতে খেলেন না। এক কাপ দুধ খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। তিনি বিছানায় শুয়ে থাকবেন ঠিকই তবে অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম আসবে না। বিছানায় কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করে আবারো

উঠে পড়বেন।

মীরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে রইল। মা'র কথা তার কাছে সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কারণ এই ছেলে টেলিফোনে একবার বলেছিল— মীরা তুমি আজ শাড়ি পরেছ কেন? শাড়িতে তোমাকে অনেক বড় বড় লাগছে।

মীরা অবাক হয়ে বলেছে— আরে সত্যি তো। আমি আসলেই শাড়ি পরেছি। তুমি জানলে কি ভাবে?

ম্যাজিকের মাধ্যমে জানলাম।

বল তো শাড়ির রঙ কি। তাহলে বুঝব তুমি ম্যাজিক জান।

রঙ হচ্ছে আকাশি।

হয় নি। রঙ মেরুন সবুজ পাড়।

মীরা বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তার ঘুম আসছে না। চাকর টাইপ একটা লোকের সঙ্গে সে দিনের পর দিন তুমি তুমি করে কথা বলেছে। নানান রকম আহ্লাদী করেছে। মজনু ভাইয়ের সঙ্গে গতকালই দেখা হলো। মীরা স্কুলে যাবার জন্যে রিকশা খুঁজছে— মজনু ভাই বাজার করে ফিরছেন। হাত ভর্তি বাজার। একটা চটের ব্যাগ— এমন ভারি যে তাকে নুয়ে পড়তে হচ্ছে। মীরা তাকে দেখেই বলল, মজনু ভাই একটা রিকশা ডেকে দিন তো। মজনু ভাই সঙ্গে সঙ্গে রিকশার খোঁজে গেল। বাজারটা রেখে যেতে পারত। তা করল না, বাজার হাতে করেই গেল। রিকশা নিয়ে ফিরে এসে বলল, মীরা রিকশা ভাড়া দিও না।

মীরা বলল, ভাড়া দেব না কেন?

রিকশা ভাড়া আমি দিয়ে দিয়েছি।

আপনি কেন দেবেন?

ভাংতি ছিল দিয়ে দিয়েছি।

মজনু ভাই বাজারের ব্যাগ নামিয়ে কপালের ঘাম মুছে আনন্দে হাসতে লাগলেন। যেন বিরাট একটা কাজ করেছেন। রাজকন্যা স্কুলে যাবে তার জন্যে এরোপ্লেন কিনে নিয়ে এসেছেন।

মীরার প্রচণ্ড রাগ লাগছে। রাগটা কিছুতেই কমছে না। রাগ নিয়ে ঘুমুতে যাওয়া ঠিক না। ঘুম ভালো হয় না। ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরে। স্বপ্নের মধ্যে মনে হয় বিকট কোনো জন্তু বুকের ওপর চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। জন্তুটার গায়ে বোটকা গন্ধ। জন্তুটাকে যে স্থির হয়ে বসে থাকে তাও না। নড়াচড়া করে। মাঝে মাঝে কপালে হাত দেয়। সেই হাত বরফের মতো শীতল এবং শিশুর হাতের মতো ছোট।

বোবার হাত থেকে বাঁচার জন্যে একা বিছানায় শোয়া যাবে না। অন্য কাউকে নিয়ে ঘুমুতে হবে। আপার সঙ্গে ঘুমানো যায়। চিত্রার সঙ্গে ঘুমুতে যাবার একটাই সমস্যা চিত্রা গুটুর গুটুর করে সারারাতই গল্প করবে। হয়তো মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে— চিত্রা খিলখিল করে হেসে ওঠে বলবে, এই মীরা আজ কি হয়েছে শোন।

আপা ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ঘুমঘুম চোখেই শোন।

প্লিজ।

BANGLABOOK.COM

না শুনলে না শুনবি। আমি বলে যাচ্ছি। তুই দুই হাতে কান চেপে পড়ে থাক। হয়েছে কি আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে পড়ে তার নাম— কামরুল হুদা। আমরা সবাই তাকে ডাকি কামরুল বেহুদা। স্মার্ট ছেলে, কাজের ছেলে, পড়াশোনাতেও ভালো। টাল্টুবাল্টু টাইপ না। সে একদিন আমার কাছে এসে বলল— "চিত্রা সবাই আমাকে বেহুদা ডাকে। খুব ভালো কথা। তুমি বেহুদা ডাকবে কেন?" আমি বললাম, সবাই ডাকলে যদি দোষ না হয়, আমি ডাকলেইবা দোষ হবে কেন? এই মীরা গল্পটা শুনছিস না ঘুমিয়ে পড়ছিস। আচ্ছা তারপর কি হয়েছে শোন— আমার কথা শুনে কামরুল বেহুদা কেমন যেন হয়ে গেল। তারপর আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে ফট করে আমার হাত ধরে গদগদ গলায় বলল, চিত্রা তুমি এটা কি বললে?

মীরার ততক্ষণে ঘুম সম্পূর্ণ কেটে গেছে। সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বলেছে— কি সর্বনাশ! তারপর?

তোর ঘুম কেটেছে?

হ্যাঁ। তারপর কি হয়েছে?

চিত্রা হাই তুলতে তুলতে বলল, কিছুই হয় নি। তোর ঘুম ভাঙাবার জন্যে এই গল্পটা বানালাম। কামরুল বেহুদা নামে আমাদের ক্লাসে একজন ছাত্র সত্যিই আছে। বেহুদা ডাকলে সে খুশিই হয়। দাঁত বের করে হাসে। তার প্রধান কাজ হলো ক্লাসের মেয়েদের বাসায় টেলিফোন করা এবং গম্ভীর ভঙ্গিতে বলা— আমি বেহুদা বলছি।

একটা মিথ্যা গল্প বলে আমার ঘুম ভাঙালে?

হ্যাঁ। সত্যি গল্প শুনলে কখনো কারো ঘুম ভাঙে না। উল্টা আরো ঘুম পায়। ঘুম ভাঙে মিথ্যা গল্প শুনলে। ঘুম ভাঙানোয় তোর মেজাজ খারাপ হয়েছে তো? এখন কেন ঘুম ভাঙিয়েছি সেই কারণ জানলে মেজাজ আরো খারাপ হবে।

কেন ঘুম ভাঙিয়েছ?

গান গাইতে ইচ্ছা করছে। আমি গান গাইব তুই শুনবি।

অসম্ভব।

কিন্নর কণ্ঠের একজন শিল্পী নিজের ইচ্ছায় তোকে গান শুনাতে চাচ্ছে তুই শুনবি না? বল তো তুই কেমন মেয়ে? একদিন যখন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আমি খুবই বিখ্যাত হয়ে যাব তুই তো পড়বি মহাবিপদে।

কি বিপদে?

আমি একটা বই লিখব— আমার সঙ্গীত জীবন। সেখানে এই ঘটনার উল্লেখ থাকবে। বই পড়ে তোর ছেলে-মেয়েরা রাগ করে তোকে বলবে, মা তুমি বড় খালার সঙ্গে এরকম করতে পারলে? ছিঃ মা ছিঃ।

মীরাকে বাধ্য হয়ে গান শুনতে হবে। চিত্রা তার প্রিয় গান গাইবে। একটাই গান— রবীন্দ্র সঙ্গীত। নজরুল গীতির শিল্পীর প্রিয় গান হল রবীন্দ্র সঙ্গীত—

বধূ কোন আলো লাগল চোখে
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে!
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গান। চিত্রাঙ্গদা গিয়েছে বনে হরিণ শিকারে। সেখানে দেখা হলো অর্জুনের সঙ্গে। তখনি এই গান। এই গান গাইবার সময় চিত্রার চোখে সব সময় পানি আসে। মীরার সমস্যা হলো বোনের চোখে পানি দেখলে তার চোখেও পানি আসে। গান শুনতে গিয়ে যদি কাঁদতে হয় তাহলে সেই গান শোনার দরকার কি?

মীরার ইচ্ছা করছে বোনের সঙ্গে গিয়ে ঘুমুতে, আবার মনে হচ্ছে থাক দরকার নেই। সেখানে যাওয়া মানেই রাত জাগা। ঘুম পাচ্ছে। মীরা জানে ঘুমিয়ে পড়লে আজ তাকে বোবায় ধরবেই। ধরলে ধরুক। বোবা তাকে গলা টিপে মেরে ফেলুক। তাহলেই তার উচিত শিক্ষা হবে। কি লজ্জা কি ঘেন্না। চাকর শ্রেণীর একজনের সঙ্গে গভীর আবেগে সে প্রেমের কথা বলে যাচ্ছে। তুমি তুমি করছে। মীরার বুদ্ধি কম বলে সে বুঝতে পারে নি। অন্য যে কোনো মেয়ে ব্যাপারটা চট করে ধরে ফেলত। যখন টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছে না তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিল। ছেলেরা এইসব ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে টেলিফোন নাম্বার দেয়। অথচ এই ছেলে দিচ্ছিল না। আর মীরা বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত

দিয়ে বসে আছে।

মীরা ঘুমুচ্ছিস?

মা দরজায় টোকা দিচ্ছেন। মীরা জবাব না দিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাকতে পারে। এটা ঠিক হবে না। কোনো না কোনো ভাবে মা ধরে ফেলবেন যে মীরা জেগে আছে। তার চেয়ে উত্তর দেয়া ভালো।

কি রে কথা বলছিস না কেন?

মীরা বিছানা থেকে দরজা খুলে বের হয়ে এল। শায়লা শান্ত গলায় বললেন, চুপি চুপি একটু বারান্দায় যা তো।

BANGLABOOK.COM

মীরা বলল, কেন?

শুয়েছিলাম ঘুম আসছিল না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি তোর বাবা মাছের চৌবাচ্চার পাশে বসে আছে। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। চুপি চুপি তোর বাবার পেছনে গিয়ে দাঁড়া, তারপর শুনতো সে কি বলে।

মীরা বলল, থাক না মা শোনার দরকার কি? সব মানুষই যখন একা থাকে তখন নিজের মনে কথা বলে। বাবাও তাই করছে।

তোকে জ্ঞানী হতে হবে না। যা করতে বলছি কর। বিড়বিড় করে কি বলছে শুনে আয়। নিঃশব্দে যাবি। আমি দরজা খুলে রেখেছি। তুই পা টিপে টিপে যাবি।

তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে?

না আমি শুয়ে পড়ব। ঘুমের ওষুধ খেয়েছি। এখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। তোর বাবা কি বলে শুনে রাখ। সকালে আমাকে বলবি।

মীরা পা টিপে টিপে গেল। সে তেমন কিছু দেখল না। তার বাবা চুপচাপ বসে আছেন। বিড়বিড় করছেন না। নিজের মনে কথা বলছেন না। দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলছেন না। মীরা ডাকল, বাবা।

রহমান সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

মীরা বলল, কি করছ?

রহমান সাহেব বললেন, বসে আছি রে মা। কিছু করছি না।

সিগারেট খাচ্ছ? আবার চৌবাচ্চায় ফেলবে। মা রাগারাগি করবেন। এরপর থেকে চৌবাচ্চার পাশে যখন বসেব একটা এসট্রে নিয়ে বসবে। তুমি এসট্রে খুঁজে না পেলে আমাকে বলবে।

আচ্ছা।

মীরার হঠাৎ তার বাবার জন্যে খুব মমতা লাগল। এই বাড়িতে মানুষটা খুবই একা। কারো সঙ্গেই তার যোগ নেই। কেউ তার সঙ্গে বসে সুখ-দুঃখের কোনো কথাও বলে না। কিছু কিছু মানুষ হঠাৎ ছায়া হয়ে যায়। মানুষটার অস্তিত্ব থাকে না। শুধু ছায়া ঘুরে বেড়ায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাব হয়। ছায়া মানুষের সঙ্গে ভাব হয় ছায়া মানুষের। এ বাড়িতে আরেকজন ছায়া মানুষ থাকলে ভালো হত। দু'জন ছায়া মানুষ গল্প করত।

বাবা!

কি?

একটা গল্প বল তো।

রহমান সাহেব খুবই অবাক হয়ে বললেন, কি গল্প?

মীরা বলল, যে কোনো গল্প। তোমার ছেলেবেলার গল্প, কিংবা তোমার অফিসের গল্প। শৈশবের একটা স্মৃতির গল্প বল শুনি। ইন্টারেস্টিং কোনো স্মৃতি। তুমি তোমারটা বলবে। আমি বলব আমারটা।

তোরটা আগে বল।

মীরা খুব আগ্রহের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে গল্প শুরু করল। বাবা আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। ফোর্থ পিরিয়ড চলছে। অঙ্ক মিস ক্লাস নিচ্ছেন। হঠাৎ স্কুলের দপ্তরি এসে বলল, মীরা রোল ২৬ বড় আপা ডাকেন। বড় আপা হলেন আমাদের হেড মিসট্রেস। আমরা সবাই তাঁকে যমের মতো ভয় পাই। ভয়ে আমার হাত পা কাঁপতে লাগল। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে উনার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি আপা খুব খুশি। আমাকে দেখে আহ্লাদী গলায় বললেন, কি রে তোর নাম মীরা! কেমন আছিস?

আমি ফিসফিস করে বললাম, ভালো।

দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বোস।

আমি আপার সামনের চেয়ারে বসলাম। আপা আরো আহ্লাদী করে বললেন, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে রে?

আমি বললাম, ভালো।

কোন সমস্যা হলে আমাকে বলবি।

আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা।

তোর জন্যে চকলেট আনিয়ে রেখেছি। নে খা। চকলেট খেয়ে কিন্তু কুলি করে দাঁত পরিষ্কার করতে হয়। নয়তো দাঁতে মিষ্টি লেগে থাকবে। সেখান থেকে ক্যারিজ হবে। ক্যারিজ কি জানিস তো? দাঁতের পোকা।

ভয়ে ভয়ে চকলেট হাতে নিলাম। তখন আপা বললেন, তোর এক চাচা যে পূর্তমন্ত্রী সালেহ সাহেব সেই কথা তো তুই কখনো বলিস নি।

আমি চুপ করে আছি। আমার কোনো চাচা পূর্তমন্ত্রী না। কিন্তু আপাকে সেই কথা বলার সাহস নেই। আপা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। কপালে চুমু দিয়ে বললেন, যা ক্লাসে যা। তোকে দেখেই মনে হচ্ছে তুই খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

আমি ক্লাসে চলে এলাম। এরপর স্কুলে আমার খুব খাতির হলো। সব আপারা আমাকে চেনে। সবাই আদর করে। পড়া না পারলেও কেউ কোনো দিন বকা দেয় নি। আমিও কখনো তাদের ভুল ভাঙাই নি। দেখলে বাবা কি অদ্ভুত ব্যাপার। আমি ক্লাসের কোনো বান্ধবীকে এখনো বলি নি যে পুরো ঘটনা মিথ্যা। সালেহ সাহেব বলে কোনো পূর্তমন্ত্রী আমার চাচা হওয়া দূরে থাকুক। আমি চিনিও না। পূর্তমন্ত্রী যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার তাও জানি না।

রহমান সাহেব বললেন, সালুকে তুই চিনবি না কেন? আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। বখাটে টাইপ ছিল। মন্ত্রী হবার আগে কয়েকবার এসেছে। তোকে তো খুবই আদর করত। মন্ত্রী হবার পরেও অফিসে টেলিফোন করে তোর খোঁজ করেছে। কোন ক্লাসে পড়িস এইসব জানেতে চেয়েছে। আমাকে বলেছিল হঠাৎ একদিন পুলিশ টুলিশ নিয়ে তোদের স্কুলে উপস্থিত হবে। তোকে চমকে দেবে।

মীরা অবাক হয়ে বলল, কই আমাকে তো কিছু বল নি।

বলার কি আছে?

আপার বিয়ের এনগেজমেন্টে তাঁকে দাওয়াত করেছ?

না।

কর নি কেন?

BANGLABOOK.COM

তোর মা বলেছে শুধু অফিসের দু-একজনকে বলতে। আমি একজনকে বলেছি।

বাবা তুমি অবশ্যই পূর্তমন্ত্রীকে বলবে। আমাদের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দু-একজন তো থাকা দরকার। মা কি জানে পূর্তমন্ত্রীকে তুমি চেন?

না তাকে কিছু বলি নি।

অফিসের কাকে নিমন্ত্রণ করেছ? তোমাদের বড় সাহেবকে?

না। রতনকে বলেছি। অত্যন্ত ভালো মানুষ। আমার পিওন।

মীরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। তার হাসি পাচ্ছে, কিন্তু সে হাসতে পারছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে বাবার কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে।

বাবা ঠিক স্বাভাবিক না। তাঁর তাকানো, বসে থাকা, কথাবার্তা বলা সব কিছুর মধ্যে সামান্য হলেও অস্বাভাবিকতা আছে। মীরা বলল, রাত অনেক হয়েছে বাবা চল ঘুমুতে যাই।

রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, তুই না বললি তুই একটা গল্প বলবি। তারপর আমি একটা বলব। আমারটা তো বললাম না।

মীরা বলল, বেশ তো বল।

মাছের একটা ব্যাপার, বুঝলি।

মাছের ব্যাপার মানে-কি?

রাতের বেলায় চৌবাচ্চার কাছে বসেছিলাম। তোর মা তো রাতের বেলা মাছ ঘরে নিয়ে যায়। সেই রাতে নেয় নি। হয়তো নিতে ভুলে গেছে। কিংবা মনে করেছে রোজ রাতে মাছদের নাড়াচাড়া করা ঠিক না। কিছু একটা সে ভেবেছে। মাছগুলি নেয় নি। আমি ওদের পাশে বসে সিগারেট খাচ্ছি, হঠাৎ চৌবাচ্চার ভিতরে মাছ একটা ঘাই দিল। আমি তাকালাম। তারপর দেখি একটা মাছ উপরে উঠে এসে আমাকে বলল— "আজ আমাদের খাবার দেয়া হয় নি।" মাছদের মতোই বিজবিজ করে বলল, তবে আমি স্পষ্ট শুনলাম এবং বুঝতে পারলাম। এই হলো আমার গল্প।

মীরা অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। রহমান সাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে ঘটনাটা বলে ফেলতে পেরে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন।

বাবা মাছ তোমার সঙ্গে কথা বলল?

হুঁ। তোর মা'কে আবার বলিস না। তোর মা শুনলে ভেবে বসবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দুঃশ্চিন্তা করবে। মেয়েরা আবার দুঃশ্চিন্তা করতে খুবই পছন্দ করে। দুঃশ্চিন্তা করার কোনো বিষয়ই না, এমন সব নিয়েও তারা দুঃশ্চিন্তা করে। আমার নিজের মাকে দেখেছি তো বেচারী মারাই গেছেন দুঃশ্চিন্তা করতে করতে।

তোমার মা খুব দুঃশ্চিন্তা করতেন?

অতিরিক্ত করতেন। দুঃশ্চিন্তার কারণে তিনি স্থির হয়ে এক জায়গায় বসেও থাকতে পারতেন না। ছটফট করতেন। মনে কর আমি বাথরুমে গেছি। বাথরুম থেকে বের হতে দেরি হচ্ছে। মা ভাববে আমি অজ্ঞান হয়ে বাথরুমে পড়ে আছি। তখন ছুটে এসে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলবে— ও রহমান তোর শরীর ঠিক আছে? একটু কথা বল বাবা।

ঘুমুতে এসো বাবা।

তুই যা আমি বসি আরো কিছুক্ষণ। আমার ঘুম পায় নাই। রাত তিনটার আগে আমার ঘুম পায় না। বিছানায় শুয়ে জেগে থাকার চেয়ে এখানে বসে জেগে থাকা ভালো।

মীরা চিন্তিত মুখে ঘরে ঢুকল।

BANGLABOOK.COM

রহমান সাহেবের মনে হলো গল্প বলতে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। শৈশবের গল্প বলার কথা, তিনি সেটা না করে এই বয়সের একটা কথা বলেছেন। মোটামুটি চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। শৈশবের তাঁর অনেক গল্প আছে। ইঁদারার গল্পটা বললে মীরা মজা পেত। গল্পটা সামান্য ভয়ের। তবে মীরার বয়সের ছেলেমেয়েরা ভয়ের গল্প শুনলে মজা পায়। মেয়েটাকে কোনো একদিন সময় করে গল্পটা বলতে হবে। সবচে ভালো হত যদি রোজ রাতে একটা করে গল্প বলতে পারতেন। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর তিনি চৌবাচ্চার পাশে এসে বসলেন, কিছুক্ষণ পর মেয়েরা এসে পাশে বসল। তিনি গল্প শুরু করলেন।

বুঝলি মায়েরা, আমি তখন ছোট। কত আর বয়স ছয় সাত। তখন আমাদের বাড়িতে পেত্নীর উপদ্রব হল। একটা খারাপ স্বভাবের পেত্নী খুব যন্ত্রণা শুরু করল...

ফরিদার ধারণা সে আর দশজন মানুষের মতো না। সে উল্টা মানুষ। অন্যদের বেলায় যা হয় তার বেলায় উল্টোটা হয়। সবাই জানে দুই শালিক দেখা শুভ। শুধু তার বেলায় দুই শালিক দেখা ভয়ংকর অশুভ। দুই শালিক দেখা মানেই তার ভয়ংকর কিছু ঘটবে।

আজ সকালে বারান্দায় রেলিং-এ ফরিদা দুটা শালিক বসে থাকতে দেখল। তার মনটাই গেল খারাপ হয়ে। বিরাট কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে গেল। ফরিদা হুস হুস শব্দ করে শালিক দু'টা উড়িয়ে দিতে গেল। শালিকরা নড়ল না। বসেই রইল। ফরিদা জানে শালিক দু'টা বসে থাকবে। তার বেলায় উল্টোটা তো হবেই। সে যদি থালায় করে কিছু ভাত এনে দিত তাহলে শালিক উড়ে যেত। কারণ সে উল্টো মানবী। দুষ্ট শালিক দু'টাকে যত্ন করে ভাত খাওয়াতে ইচ্ছা করছে না। হারামজাদা পাখি থাকুক বসে।

ফরিদার মনে হল সকাল বেলাতেই পাখি দু'টাকে দেখা তার জন্যে এক দিকে ভালো হয়েছে। আগে ভাগেই সাবধান হবার সুযোগ পাওয়া গেছে। বাবুকে আজ স্কুলে পাঠানো হবে না। স্কুলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সে নিজেও বাইরে বের হবে না। যদিও নিউমার্কেটে তার কিছু জরুরি কেনাকাটা ছিল। কেতলীর হ্যান্ডেল ভেঙে গেছে। একটা কেতলী কিনতে হবে। ছয়টা চায়ের কাপ কিনতে হবে। ঘরে সাতটা চায়ের কাপ আছে। এর মধ্যে দু'টা কাপের বোটা ভাঙা। ভালো চারটা কাপ চার রকমের। এই চারটার মধ্যে দু'টার আবার পিরিচ নেই। তবে যেহেতু জোড়া শালিক দেখেছে— নিউমার্কেটের কেনাকাটা বন্ধ। জহিরের সঙ্গেও আজ খুব ভালো ব্যবহার করতে হবে। এমন কিছুই করা যাবে না যেন ঝগড়া বেধে যায়। জহির অন্যায় কিছু করলেও চুপ করে থাকতে হবে।

আল্লাহর কাছে ফরিদা মানতও করে ফেলল, আজকের দিনটা যদি ভালয়

তালয় পার হয় তাহলে এশার নামাজের পর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে।

জহির ঘুম থেকে উঠল সকাল ন'টায় । খবরের কাগজ হাতে বারান্দায় এসে বসতে বসতে বলল, চা দাও তো । ফরিদা খুশি খুশি গলায় বলল, কফি খাবে?

জহির রাগী গলায় বলল, কফি এল কোথেকে?

ফরিদা বলল, এক কৌটা কিনেছি । তুমি কফি পছন্দ কর ।

আমি আবার কবে থেকে কফি পছন্দ করলাম? টাকা-পয়সার এ রকম টানাটানি এর মধ্যে তুমি কফি কিনে ফেললে? সংসার উচ্ছন্নে যাচ্ছে তোমার জন্যে এটা জান? কফির কৌটার মুখ কি খোলা হয়েছে?

না।

তাহলে কফি ফিরত দিয়ে টাকা নিয়ে আসবে।

আচ্ছা।

আচ্ছা ফাচ্ছা না। আজই যাবে।

ফরিদা চুপ করে রইল। কফির কৌটা ফেরত দিয়ে টাকা আনা যাবে না। কিছু সমস্যা আছে। কফির কৌটাটা সে দোকান থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। কাজটা সে করেছে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে । তার কাঁধে ছিল একটা বাহারি চটের ব্যাগ। সেই ব্যাগে সে কফির কৌটাটা প্রথম ঢুকাল। তারপর নিল একটা টমেটোর সস। সবশেষে দু'টা কাপড় ধোয়া সাবান । ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি বেশ বড় বড়। এমনভাবে জিনিসপত্র সাজানো যে এদিক ওদিক তাকিয়ে যে কোনো কিছু তুলিয়ে নেয়া যায়।

ফরিদা চায়ের কাপ জহিরের সামনে রাখতে রাখতে বলল, বৃহস্পতিবারটা ফ্রি রাখবে।

জহির চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, বৃহস্পতিবারে কি?

চিত্রার এনগেজমেন্ট।

চিত্রা আবার কে?

ফরিদা অবাক হয়ে বলল, চিত্রাকে তুমি জান না? বড় ভাইজানের মেয়ে।

জহির বলল, যারা আমাকে চিনে না। আমিও তাদের চিনি না। গরিব থাকবে গরিবের মতো। বড়লোক থাকবে বড়লোকের মতো। আগবাড়ায়ে খাতির জমানোর কোনো দরকার নাই।

ভাইয়ের মেয়ের এনগেজমেন্টে আমি থাকব না?

না।

তুমি এইসব কি বলছ?

এটা আমার ফাইন্যাল কথা। যারা তোমাকে চোর ভাবে। সেই বাড়িতে তুমি যাবে?

তারা আমাকে কখন চোর ভাবল?

এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ?

ফরিদা আহত গলায় বলল, কি উল্টাপাল্টা কথা বলছ? আমাকে চোর ভাববে কেন?

দুই বছর আগে তুমি তোমার ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলে। এক রাত থেকে নিজের ফ্ল্যাটে ফেরার পর কি হয়েছিল?

আমি তো জানি না কি হয়েছিল।

সকালবেলা তোমার ভাবি আমাদের বাসায় চলে এলেন। তার একটা গলার হার খুঁজে পাচ্ছেন না। তুমি ভুল করে তোমার হ্যান্ডব্যাগে নিয়ে এসেছ কি-না জানতে এসেছিলেন। তিনি নিজেই তোমার হ্যান্ডব্যাগ উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তোমার মনে নাই?

ফরিদা সহজ ভঙ্গিতে বলল, এটা ভাবী একটা ভুল করেছে। মানুষ মাত্রই ভুল করে। পরে যখন গয়নাটা পাওয়া গেল ভাবী খুবই লজ্জার মতো পড়ল। আমার কাছে এসে কেঁদে ফেলল।

গয়না পাওয়া গিয়েছিল না-কি?

দুই দিন পরই পাওয়া গেছে। কে যেন তোষকের নিচে রেখে দিয়েছিল।

গয়না পাওয়ার কথা তো আমাকে বল নি।

এটা বলার মতো কিছু না-কি? আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যখন ভাইজানের বাড়িতে যেতে নিষেধ করছ তখন যাব না। তাছাড়া খালি হাতে তো যাওয়াও যায় না। একটা কিছু তো নিয়ে যাওয়া দরকার।

দুই শালিক দেখার পর ফরিদা যে সব প্রতিজ্ঞা করেছিল তার কিছুই মনে রইল না। ফরিদা বাবুকে স্কুলে দিয়ে এসে গয়নার দোকানে চলে গেল। বড় ভাবীর গয়নাটা সে ঠিকই নিয়ে এসেছিল। ঘরে এনে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল যে কিছুদিন পর সে নিজেই ভুলে গিয়েছিল। জহিরের কথায় মনে পড়ল। গয়নাটা বিক্রি করা দরকার। চিত্রার এনগেজমেন্ট উপলক্ষে সে চিত্রার জন্যে একটা শাড়ি কিনবে। আর বিয়েতে দেবার জন্যে ছয়-সাত আনা সোনার কোনো কানের দুল। সেপ্টেম্বরের ছ'তারিখে চিত্রার বিয়ে তখন হাতে টাকা থাকবে কি

থাকবে না, তার নেই ঠিক।

চাঁদনি চকের একটা গয়নার দোকানে ফরিদার যাতায়াত আছে। দোকানের একজন কর্মচারীকে ফরিদা মামা ডাকে। গয়নার দোকানে কোনো পাতানো মামা থাকলে গয়না বিক্রি করা সহজ হয়। খুব বিপদে পড়লে এই পাতানো মামার কাছ থেকে সে টাকা ধারও নেয়।

পাতানো মামার ধার ফরিদা সময়ের আগেই শোধ দেয়। নিজের গরজেই দেয়। যে কোনো সময় ধার পাওয়া যায় এমন একটা জায়গা থাকা দরকার। পাতানো মামার নাম রবি হোসেন। লোকটাকে ফরিদার তেমন সুবিধার মনে হয় না। লোকটা প্রায়ই বলে— বাসায় এসে বেড়ায়ে যাও। সারাদিন থাকবে। খাওয়া দাওয়া করবে। খালি বাড়ি কোনো অসুবিধা নাই।

খালি বাড়ি বলেই তো অসুবিধা। লোকটার বউ থাকলে ঐ বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া কোনো সমস্যা ছিল না। তবে এই কথা ফরিদা বলে না, বরং যতবারই রবি হোসেন ফরিদাকে তার বাড়িতে যেতে বলে ততবারই ফরিদা বলে, জ্বি আচ্ছা যাব। হুট করে একদিন উপস্থিত হব। আপনাকে রান্না করে খাওয়াব। আমি খুব ভালো রান্না জানি।

কবে আসবে বল?

BANGLABOOK.COM

আগে থেকে বলে আসলে তো মজা থাকবে না। কোনো এক ছুটির দিন চলে আসব। মামা আপনার বাসায় ঝুনা নারিকেল আছে? ঝুনা নারিকেল কিনে রাখবেন।

ঝুনা নারিকেল দিয়ে কি হবে?

ঝুনা নারিকেল দিয়ে আমি একটা রান্না জানি খুবই সুস্বাদু। একবার খেলে সারাজীবন ভুলবেন না। কি করতে হয় আমি বলি— প্রথমে নারিকেলটা ফুটা করে পানি ফেলে দেবেন। তারপর মশলা মাখা ছোট ছোট চিংড়ি মাছ এই ফুটা দিয়ে ঢুকিয়ে ময়দা দিয়ে ফুটা বন্ধ করে দেবেন। এখন কয়লার আগুনে নারিকেলটা রেখে তার বাইরেরটা পুড়াবেন। পনেরো বিশ মিনিট আগুনে ঝলসানোর পর নারিকেল ভেঙে চিংড়ি মাছ বের করে গরম ভাত দিয়ে খাবেন। মনে হবে বেহেশতি কোনো খাবার খাচ্ছেন।

ঠিক আছে ঝুনা নারিকেল যোগাড় করে রাখব। তুমি কবে যাবে বল?

যে কোনো একদিন চলে যাব। আপনি ম্যাপ এঁকে বাড়ির ঠিকানা ভালো করে একটা কাগজে লিখে দিন। আমি খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলব।

ঝামেলা করে বাসায় গিয়ে দেখবে আমি নেই। তখন কি হবে?

আরেক দিন যাব।

রবি হোসেন ঠিকানা লিখে কাগজ দিয়েছে। সেই কাগজ ফরিদা তার হ্যান্ডব্যাগে রেখে দিয়েছে। সে কখনো বিপত্নীক একটা মানুষের খালি বাড়িতে উপস্থিত হবে না। এই কথাটা তাকে জানানোর দরকার কি। সে আশায় আশায় থাকুক। বিপত্নীক মানুষ যখন তার খালি বাড়িতে কোনো মেয়েকে ডাকে তার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না ফরিদা এত বোকা না। তবে লোকটার সঙ্গে সে বোকার ভান করে। মতলববাজ পুরুষ বোকা মেয়ে পছন্দ করে।

রবি হোসেন ফরিদাকে দেখে গম্ভীর গলায় বলল, খবর কি?

ফরিদা বলল, খবর ভালো। একটা গয়না বিক্রি করব। আমার শখের গয়না। দূর সম্পর্কের এক খালা বিয়েতে দিয়েছিলেন।

শখের গয়না বিক্রি করবে কেন?

টাকার দরকার। একটা গয়না বিক্রি করে আরেকটা কিনতে হবে।

রবি হোসেন বিরক্ত গলায় বলল, গয়না কেনা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। মালিকের হুকুম।

ফরিদা বলল, আমাকে বিক্রি করতেই হবে। মামা আপনি ব্যবস্থা করে দিন। আচ্ছা ভালো কথা, আগামী শুক্রবারে কি আপনি বাসায় থাকবেন।

কেন?

বাসায় থাকলে যাব। শুক্রবারে আমার কোনো কাজ নেই। বাবুকে নিয়ে তার বাবা যাবে তার এক দূর সম্পর্কের খালার বাসায়। সারাদিন থাকবে। সারাদিন আমি একা ঘরে বসে থেকে কি করব? ঝুনা নারিকেল যোগাড় করে রাখবেন। ঝুনা নারিকেল আর কয়লা।

সত্যি যাবে?

ও আল্লা সত্যি না তো কি?

ফরিদা যা ভেবেছিল তাই হল। রবি হোসেনের মুখ থেকে গম্ভীর ভাব চলে গিয়ে খুশি খুশি ভাব চলে এল। শুক্রবারের কথা ভেবে এখনই লোকটার চোখ চকচক করা শুরু করেছে। কি হারামজাদা মানুষ।

গয়না বিক্রি করে ফরিদা একজোড়া কানের টব কিনল। নগদ দু'হাজার টাকা পেল। বাড়তি যা পেল সেটাও খারাপ না। কানের টব বাছাই করার ফাঁকে ফরিদা একজোড়া ঝুমকা দুল সরিয়ে ফেলল। সিগারেট খোর লোকরা যেমন প্যাকেটের প্রতিটি সিগারেটের হিসাব রাখে গয়নার দোকানের কর্মচারীও ডিসপ্লে টেবিলের উপর রাখা প্রতিটি গয়নার হিসাব রাখে। রবি হোসেন খুব সম্ভব শুক্রবারের

চিন্তায় হিসাব রাখতে পারল না। ফরিদা বলতে গেলে তার চোখের সামনে থেকে কানের টব সরিয়ে ফেলল, লোকটা বুঝতেই পারল না।

দু' হাজার টাকা ফরিদা অতি দ্রুত খরচ করে ফেলল। এনগেজমেন্টের দিন চিত্রাকে উপহার দেবার জন্যে সাতশ টাকা দিয়ে হালকা গোলাপি রঙের একটা শাড়ি কিনল। একটা টি সেট কিনল। জহিরের জন্যে দু'টা স্ট্রাইপ দেয়া সার্ট কিনল। বাবুর জন্যে ফুটবল। বাবু কয়েকদিন ধরেই পোলাও খেতে চাচ্ছিল। ফরিদা কাঁচাবাজার থেকে পোলাও-এর চাল, মুরগি, কিনল। তারপরও তার হাতে দেড়শ টাকা রইল। এই টাকাটাও সে খরচ করে ফেলত কিন্তু বাবুর স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। তাকে আনতে যেতে হবে।

বিকেল পর্যন্ত ফরিদার সময় খুব ভালো কাটল। সকালবেলা জোড়া শালিক দেখায় তেমন কিছু হল না। ফরিদার মনে হল আজকের দিনটা সে ভালো ভাবেই পার করে দিতে পারবে।

BANGLABOOK.COM

জহির অফিস থেকে ফিরল পাঁচটায়। তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। ভুরু কুঁচকে আছে। দেখেই মনে হচ্ছে সে রাগ চেপে আছে। বেশিক্ষণ রাগ চেপে রাখলে চোখ লালচে হয়ে থাকে। জহিরের চোখ লাল।

ফরিদা বলল, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?

জহির বলল, না।

চোখ মুখ শক্ত করে আছ। অফিসে কিছু ঘটেছে?

জহির বলল, না।

ফরিদা চা আনতে গেলে। নতুন টি পটে করে চা এনে জহিরের সামনে রাখল। টি পটটা এত সুন্দর যে দেখবে তারই মন ভালো হয়ে যাবে। টি পটের সঙ্গে দু'টা কাপ। দু'জন এক সঙ্গে বসে চা খাওয়া। ফরিদা বলল, চায়ের সঙ্গে কি খাবে? চিড়া ভেজে দেব?

জহির বলল, চিড়া পরে ভাজবে। আগে বল তুমি কি আমার কোটের পকেটে হাত দিয়ে ছিলে?

কোটের পকেটে হাত দেব কেন?

কোটের পকেটে তিনটা পাঁচশ টাকার নোট ছিল। নোট দু'টা নেই।

তোমার কাছ থেকে আমি টাকা চুরি করব?

আগে তো অনেকবারই করেছ। আমার পকেট থেকে টাকা নেয়া তো নতুন কিছু না।

আমি তোমার কোটের পকেটে হাত দেই নি। টাকাও নেই নি।

সত্যি কথা বল।

সত্যি কথাই বলছি।

এই টি পটটা নতুন কিনেছ না?

হুঁ।

কবে কিনেছ?

আজ কিনেছি।

টাকা কোথায় পেয়েছ?

আমার কাছে কিছু টাকা ছিল। ভাইজান কয়েকদিন আগে যে এসেছিলেন ইলিশ মাছ নিয়ে তখন দিয়ে গেছেন।

জহির থমথম গলায় বলল, এখনো সময় আছে সত্যি কথা বল।

সত্যি কথাই তো বলছি।

তোমার ভাই এসে হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়ে গেল। ফাজলামী করছ। দিনের পর দিন যে ভাইয়ের কোন খোঁজ নাই, সেই ভাই হয়ে গেল হাজী মোহাম্মদ মহসিন?

ভাইজান সম্পর্কে এইভাবে কথা বলবে না।

তোমার ভাইজান সম্পর্কে কি ভাবে কথা বলতে হবে নিল ডাউন হয়ে?

ফরিদার চোখে পানি এসে গেল। জহির কঠিন গলায় বলল, চোখের পানি মুছ। এক্ষুণি মুছ। আর কাপড় পর।

ফরিদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, কাপড় পরব কেন?

জহির কঠিন গলায় বলল, হাতেনাতে চোর ধরব। তোমার ভাইজানকে জিজ্ঞেস করব— ইলিশ মাছের সঙ্গে কত টাকা দিয়েছেন? আজ আমি হেস্ত নেস্ত করব। ধান কুটে বের করে ফেলব কত ধানে কত চাল।

ফরিদা হতাশ বোধ করছে। জহিরের কোটের পকেট থেকে সে কোনো টাকা নেয় নি। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে অপরাধ না করেও অপরাধ স্বীকার করে নেয়াটা মঙ্গলজনক হবে। সে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল, তোমার কোটের পকেট থেকে আমি টাকা নিয়েছি। এখন কি করবে? আমাকে মারবে? গায়ে গরম চা ঢেলে দেবে?

জহির কিছু বলছে না। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। তার ভাব ভঙ্গি শান্ত। এই শান্ত ভঙ্গিটাকেই ফরিদার ভয়। ভয়ঙ্কর কিছু করার আগে আগে মানুষ শান্ত

হয়ে যায়।

জহির কি করতে পারে ফরিদা দ্রুত চিন্তা করছে। চড় থাপড় দিতে পারে। দিলে খারাপ না, বাবু বাসায় নেই সে দেখবে না। ঘরে কোনো কাজের লোকও নেই। কেউ জানবে না। (এই জাতীয় দৃশ্য কাজের লোকদের দেখা মানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। প্রতিটি ফ্ল্যাটের লোকজন জেনে যাবে।) গায়ে গরম চা ঢেলে দিতে পারে। আগে একবার দিয়েছে। ভাগ্যিস মুখে পড়ে নি। কাঁধে আর বুকে পড়েছিল। ফুসকা পড়ে ঘা হয়ে বিশ্রী অবস্থা। ডাক্তারের কাছে গিয়ে ব্লাউজ খুলে বুক দেখাতে হয়েছে। চোখ দিয়ে দেখলেই বুঝা যায় কতটুক পুড়েছে— কিন্তু সেই বদ ডাক্তার আবার নানান ভঙ্গিমায় হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছে। ওষুধ দিয়ে বলেছে— "কাল আবার আসবেন। ড্রেসিং করে দেব। বুকের সেনসেটিভ স্কিন পুড়েছে তো এই জন্যেই চিন্তা।" কথা শেষ করে ব্যাটা আবার বুকে হাত দিয়েছে।

জহির যদি আজ গায়ে চা ঢেলে দেয়— তেমন কোনো সমস্যা হবে না। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শরীর পুড়ে গেলেও ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। আগের বারের মলমটা এখনো আছে। ফরিদা যত্ন করে তুলে রেখেছে। একবার চা ফেলে দিয়েছে, অভ্যাস হয়ে গেছে। আবারো ফেলবে।

জহির তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে। এর আগেও কয়েকবার বের করেছে। বের করে দিলে খুবই খারাপ হবে। ফরিদার ভয়ঙ্কর কষ্ট হবে। বাসা থেকে বের করে দিলেই ফরিদার মনে হয় এই পৃথিবীতে তার কেউ নেই। তার তখন ইচ্ছা করে কোনো চলন্ত ট্রাকের নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে। সাহসে কুলায় না। তার সাহস খুব কম।

রহমান সাহেব বাসায় ফিরলেন রাত আটটায়। ঘরে ঢুকতেই শায়লার সঙ্গে দেখা। শায়লা গম্ভীর মুখে বললেন, পেছনের বারান্দায় এসো তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রহমান সাহেবের বুক ধক করে উঠল। খারাপ কিছু কি ঘটেছে? সময় ভালো না। সবার জন্যে দুঃসময়। চারদিকে খারাপ খারাপ ঘটনা ঘটছে। তার বাড়িতেও যে ঘটবে এটা বিচিত্র কিছু না। তাঁর কোনো মেয়ের মুখে কি কেউ এসিড মেরেছে? মাইক্রোবাসে করে একদল যুবক এসে উঠিয়ে নিয়ে গেছে চিত্রাকে? রহমান সাহেবের বুক ধক ধক করছে। তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, কি হয়েছে?

শায়লা গলা নামিয়ে বললেন, তোমার বোন বিছানা বালিশ নিয়ে চলে এসেছে। এখন থেকে না-কি আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

রহমান সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ও আচ্ছা।

শায়লা বললেন, ও আচ্ছা মানে? তুমি এক্ষুণি তাকে তার বাসায় রেখে আসবে। কাল আমার মেয়ের এনগেজমেন্ট এই সময় আমি বাড়িতে কোনো ঝামেলা রাখব না।

ঝামেলা কেন?

অবশ্যই ঝামেলা। তোমার এই বোনকে আমার খুবই অপছন্দ। শুধু আমার না, বাড়ির সবারই। সে সুযোগ পেলেই জিনিসপত্র সরায়। চিত্রার মামা আমেরিকা থেকে চিত্রার জন্যে ফ্লেক্সিবল কলম পাঠিয়েছিল। চিত্রার কত শখের জিনিস। সেই জিনিস সরিয়ে ফেলল। তোমার বোনের বাসায় যখন সেই কলম পাওয়া গেল, সে বলল চিত্রার কলমটা দেখে তার খুবই পছন্দ হয়েছে। সে গুলশান মার্কেট ঘুরে ঘুরে অবিকল চিত্রার কলমের মতো একটা কলম কিনেছে।

রহমান সাহেব বললেন, বিদেশী সব জিনিসই এখন দেশে পাওয়া যায়।

শায়লা কঠিন গলায় বললেন, বোনের পক্ষে কোন ওকালতি করবে না। তোমার বোনকে তুমি চেন না। আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আমার মুক্তা বসানো গলায় হার সে যে নিয়েছে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।

রহমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ও থাকতে এসেছে কেন?

সেটা তাকেই জিজ্ঞেস কর। হেন তেন নানান কথা বলছে। তার গায়ে নাকি গরম চা ফেলে দিয়েছে। বাসা থেকে বের হয়ে যেতে বলেছে। কুৎসিত গালাগালি করেছে। মাগী ডেকেছে। সেটা তাদের ব্যাপার। আমি তাতে নাক গলাব না। তুমি তোমার গুণবতী বোনকে তার বাসায় রেখে আস। তা যদি না পার শেরাটন হোটেলে স্যুট ভাড়া করে সেখানে রাখ। আমার এখানে রাখতে পারবে না।

আচ্ছা দেখি।

আচ্ছা দেখি না। এক্ষুণি যাও। রিকশা ডেকে নিয়ে এস। তারপর বোনকে নিয়ে রিকশায় উঠ।

আজকের রাতটা থাকুক। কাল সকালে আমি দিয়ে আসব।

অবশ্যই না। যাও রিকশা আন।

রিকশায় উঠতে উঠতে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ভাইজান আমরা কোথায় যাচ্ছি?

তোর বাসায় তোকে দিয়ে আসি। জহিরের সঙ্গে মিটমাট করিয়ে দেই।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়— আবার ঝগড়া মিটেও যায়।

ঐ বাড়িতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না ভাইজান।

ঐ বাড়ি ছাড়া যাবি কোথায়?

তোমার কাছে কয়েকদিন থাকতে পারব না?

রহমান সাহেব চুপ করে রইলেন। ফরিদা বলল, ভাইজান তুমি বুঝতে পারছ না। বাবুর বাবা তোমাকে খুবই অপমান করবে। তুমি সোজা সরল মানুষ। তোমাকে অপমান করলে আমার খারাপ লাগবে।

রহমান সাহেব বোনের পিঠে হাত রেখে নরম গলায় বললেন, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আবার মান অপমান কি? রাগের সময় জহির কিছু উল্টা পাল্টা কাজ করেছে। এখন নিশ্চয়ই রাগ পড়ে গেছে। এখন সে লজ্জিত। দেখবি আমি সব ঠিক ঠিক করে দিয়ে আসব। রাতে তোদের সঙ্গে ভাত খাব। দরকার হলে রাতটা তোদের সঙ্গে থাকব।

ভালো সময়ে কত থাকতে বলেছি— তুমি থাক নি। আজ থাকবে।

তুই কাঁদিস না। বেশি কাঁদা হার্টের জন্যে খারাপ। হার্টে প্রেসার পড়ে। আমি পত্রিকায় পড়েছি। তুই বরং এক কাজ কর, মনে মনে ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে থাক। এতে বিপদ কাটা যায়। আমি নিজেও পড়ছি।

ফরিদা বড়ভাই-এর কথা অনুযায়ী মনে মনে ওয়াস্তাগাফিরুল্লাহ পড়ছে এবং তার মনে হচ্ছে— এতে কাজ দিবে। বাসায় গিয়ে দেখবে জহিরের রাগ পড়ে গেছে। সে ভালো মানুষের মতো বসে আছে। ফরিদাকে দেখে যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে বলবে— তাড়াতাড়ি খাবার দাও তো ক্ষিধে লেগেছে। বাবু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে ঘুম থেকে তোল।

মুরগির কোরমা রান্না করাই আছে। পোলাও রেঁধে ফেলতে হবে। ভাইজান খাবে বলেছে তার জন্যে ঝাল তরকারি একটা থাকলে ভালো হত। ঘরে বেগুন আছে। বেগুন ভেজে দিলে হয়। বেগুনটা আজ অন্য রকম ভাবে ভাজি করবে। বেগুন কুচি কুচি করে তার সঙ্গে নারকেল। ভাইজান রাতে থাকবে। পরিষ্কার চাদর আছে কি-না কে জানে। মনে হচ্ছে নেই। বিছানার চাদর ফরিদা নিজে ধুতে পারে না। লন্ড্রিতে ধোয়াতে হয়। লন্ড্রিতে পাঠানোর কাপড়ে সে এক জায়গায় করে রেখেছে। পাঠানো হয় নি। এর পর থেকে গেস্টরুমের জন্যে এক সেট চাদর, বালিশের ওয়ার ধুয়ে তুলে রাখতে হবে।

ভাইজান।

কি রে?

মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তোমার কেমন লাগছে?

কোনো রকম লাগছে না।

আমার অদ্ভুত লাগছে। মেয়েটা বড় হয়েছে আমার কাছে মনেই হয় না। ছেলেবেলায় ও যে দাড়িওয়ালা মানুষ দেখলেই কাঁদত এটা কি তোমার মনে আছে?

না।

কি আশ্চর্য! তোমার মনে থাকার তো কথা। দাড়িওয়ালা কাউকে দেখলেই ও ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। চিৎকার করে কান্না। তখন আমি তাকে বলতাম— দেখিস তোর বিয়ে হবে দাড়িওয়ালা বরের সঙ্গে। ভাইজান ওর বরের কি দাড়ি আছে? আমি সাধারণ দাড়ির কথা বলছি না, ফ্রেঞ্চকাট টাইপ স্টাইলের দাড়ি।

জানি না তো।

সে কি তুমি ওর বরকে এখনো দেখ নি?

না।

ওর বরের নাম কি?

জানি না।

সত্যি জান না।

জানতাম এখন ভুলে গেছি।

তুমি তো ভাইজান খুবই আশ্চর্য মানুষ।

হুঁ।

তুমি অবশ্যি আগে থেকেই আশ্চর্য ছিলে— এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বেশি আশ্চর্য মানুষ হচ্ছ। তোমাকে যে ওষুধগুলি খেতে দিয়েছিলাম সেগুলি খাচ্ছ?

হুঁ।

তোমার চেহারা ভয়ংকর খারাপ হয়ে গেছে। চেহারার মধ্যে ভিখিরী ভিখিরী ভাব এসে গেছে। মাথার সব চুল পাকা। তোমার পাশে ভাবীকে দেখলে মনে হয় ভাবী তোমার মেয়ে। তুমি চুলে কলপ দিও তো।

আচ্ছা।

তুমি মুখে বলবে আচ্ছা। কিন্তু আসলে দেবে না। আমি ব্যবস্থা করব। রাতে তুমি তো আমার এখানে থাকবে— আমি দোকান থেকে বাবুর বাবাকে দিয়ে একটা কলপ আনিয়ে সকালে চুলে কলপ দিয়ে দেব।

আচ্ছা।

ফরিদাদের ফ্ল্যাটে বাতি জ্বলছে। লোকজনের কথা শোনা যাচ্ছে। রহমান সাহেব বললেন, তোর বাসায় মনে হয় অনেক লোকজন। ফরিদা ক্ষীণ গলায় বলল, ওর বন্ধুরা এসেছে। তাস খেলছে। ফরিদা কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে। বন্ধুদের সামনে জহির নিশ্চয়ই খুব খারাপ ব্যবহার করবে না। তাছাড়া সঙ্গে তার বড়ভাই আছে। বাবুর জন্যেও ফরিদার একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। বাবু কি বাসায় আছে? ঘুমিয়ে পড়েছে? না-কি জহির বাবুকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে?

ফরিদা ভয়ে ভয়ে কলিং বেল টিপল। একবার, দু'বার তিনবার। চতুর্থবার কলিং বেল টিপতেই জহির বের হয়ে এল। তার পরনে লুঙ্গি। খালি গা। ফরিদার বুক ধক করে উঠল। জহির মদ খেয়েছে। তার চোখ লাল। মদ খেলেই জহিরের চোখ লাল হয়ে যায়। ঠোঁট ফুলে ওঠে। নেশাগ্রস্ত মানুষ কোনো কিছুরই ধার ধারে না। সে কি করবে কে জানে। নোংরা গালি গালাজ না করলেই হয়। মদ খেলেই জহিরের মুখ থেকে কুৎসিত সব গালাগালি বের হয়। বস্তির লোকরা যে ভঙ্গিতে বলে— তোর মাকে এই করি। সেও ঠিক তাই বলে। তাদের চেয়েও খারাপ ভাবে বলে। ফরিদার হাত-পা কাঁপতে লাগল।

জহির কিছুক্ষণ তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে রহমান সাহেবের দিকে তাকাল। থমথমে গলায় বলল, ভাইজান আপনি এই হারামজাদীকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন?

রহমান সাহেব থতমত খেয়ে গেলেন। জহির বলল, এই কুত্তীকে আমি সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে তিন তালাক বলেছি। সে এটা আপনাকে বলে নাই?

রহমান সাহেব কি বলবেন বুঝতে পারছেন না। তার সব চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। জহির বলল, একে নিয়ে চলে যান। যদি না যান, তাহলে আপনার সামনেই মাগীর পাছায় এক লাথি মেরে তাকে সিঁড়িতে ফেলে দেব।

রহমান সাহেব কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, জহির এইসব তুমি কি বলছ?

যা সত্যি তাই বলছি। এক্ষুণি একে নিয়ে বিদায় হন।

রাগের মাথায় তালাক বললে তালাক হয় না।

আপনাকে এতক্ষণ কি বললাম আমি যা বলেছি ঠাণ্ডা মাথায় বলেছি। অনেক বিচার বিবেচনা করে বলেছি। এখন আপনি যান। নয়তো বোনের কারণে আপনি অপমান হবেন।

জহির ঘরে ঢুকে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিল। রহমান সাহেব কি করবেন বুঝতে পারছেন না। ফরিদাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফেরা যাবে না। আত্মীয়

স্বজন এমন কেউ নেই যার বাড়িতে তাকে নিয়ে তুলেন।

ফরিদা নিঃশব্দে কাঁদছে। রহমান সাহেবের খুবই মায়া লাগছে। তারচেয়েও বেশি লাগছে ভয়। ফরিদা বলল, ভাইজান এখন কি করব? রহমান সাহেব বললেন, বুঝতে পারছি না।

তোমার কাছে কি টাকা আছে ভাইজান। আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে যাও। রাতটা কাটুক।

সত্তর টাকা আছে।

তাহলে চল কমলাপুর রেল স্টেশনে যাই। রেলস্টেশনে রাতটা কাটাই।

আচ্ছা।

আচ্ছা বলে রহমান সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন। ফরিদা বলল, কোথায় যাচ্ছ? রহমান সাহেব বললেন, এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনি। তুই একটু দাঁড়া।

আমার খুব পানির পিপাসা হয়েছে। ভাইজান এক বোতল পানি নিয়ে এসো। গলা কেমন শুকিয়ে গেছে।

আচ্ছা পানিও নিয়ে আসব।

BANGLABOOK.COM

রহমান সাহেব সিগারেট কিনলেন। সিগারেট ধরালেন। বড় এক বোতল পানি কিনলেন। ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন নিজের বাড়ির দিকে। বোনের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। খালি পেটে সিগারেট খাওয়ার জন্যে তাঁর সামান্য মাথা ঘুরছে। বমি বমি আসছে। তিনি পানির বোতলের মুখ খুলে বোতলের পানির অর্ধেকটা এক টানে শেষ করে ফেললেন। বমি ভাব আরো বাড়ল, তৃষ্ণা মিটল না। তিনি রাস্তার পাশে বসে বমি করলেন।

আগামীকাল মেয়ের এনগেজমেন্ট। সব খাবার দাবারই আসছে বাইরে থেকে। ঘরের কোনো আইটেম না থাকলে খারাপ দেখা যায় বলেই শায়লা কাওনের চালের পায়েস বসিয়েছেন। রান্না বান্নার ঝামেলা আগের রাতেই মিটিয়ে ফেলতে চান। আগামীকাল তিনি রান্না ঘরে ঢুকবেন না। তিনি চিত্রাকে এনে পাশে বসিয়েছেন। চিত্রার দায়িত্ব হল মাঝে মাঝে চামুচ দিয়ে পায়েস নেড়ে দেয়া। পায়েস যেন ধরে না যায়। শায়লা মেয়েকে দিয়ে এই কাজটা ইচ্ছা করেই করাচ্ছেন

যাতে বরপক্ষের লোকদের বলতে পারেন— পায়েস রেঁধেছে চিত্রা। প্রসঙ্গ ছাড়া অবশ্যি কথাটা বলা যাবে না। প্রসঙ্গ উঠলে তবেই বলতে হবে। বর পক্ষের কেউ যদি পায়েস মুখে দিয়ে বলে— বাহ্ খেতে ভালো হয়েছে তো তাহলেই তিনি বলবেন, পায়েস রেঁধেছে চিত্রা।

চিত্রা বলল, মা ফুপুকে এত রাতে ফেরত পাঠানো ঠিক হয় নি। বেচারী বিপদে পড়ে তার ভাইয়ের কাছে এসেছে। আমার নিজের কোনো ভাই নেই, তারপরেও আমি বুঝতে পারছি যে কোনো বোনের অধিকার আছে বিপদে পড়লে তার ভাইয়ের কাছে আসা।

শায়লা বিরক্ত মুখে বললেন, এইসব সাজানো বিপদ। দু'দিন পর পর বিপদের কথা বলে উপস্থিত হয়। যখন চলে যায় তখন দেখা যায়— আমার গলার হার নেই, তোর কানের দুল নেই। এই যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হয় না। তারচেয়েও বড় কথা তোর ফুপু যদি থেকে যায়— এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠানে উল্টাপাল্টা কথা বলে সর্বনাশ করে দেবে। তোর শ্বশুরকেই হয়তো বলবে— জানেন আমার স্বামী আমাকে মাগী ডেকেছে আর গায়ে গরম চা ঢেলে দিয়েছে।

চিত্রা বলল তা অবশ্যি ঠিক। ফুপু ভয়ঙ্কর বোকা। কখন কি বলা উচিত। কাকে কি বলা যায় এর কোনো ধারণাই নেই। আমাকে কি বলছিল জান মা?

কি বলছিল?

না থাক।

মা'র সঙ্গে চিত্রার সব রকম কথা হয়। তারপরেও কিছু কিছু কথা না হওয়াই ভালো।

শায়লা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তোর ফুপু কি বলছিল?

এমন কোনো জরুরি কথা না। নারী পুরুষ সম্পর্কের বিষয়ে কিছু কথা যা একজন ফুপু তার ভাইস্তিকে বলতে পারেন না। এবং আমিও তোমাকে বলতে পারব না।

শায়লা রাগী গলায় বললেন, না বলতে চাইলে বলবি না।

চিত্রা বলল, মা তোমার সঙ্গে আরেকটা ব্যাপারে ক্লিয়ার করতে চাই। আমি কিন্তু আগামীকাল গান গাইব না।

তোকে তো গান গাইতে বলছি না।

এখন বলছ না। কিন্তু সময় মতো ঠিকই বলবে। তুমি তবলচিকে খবর দিয়েছ, নিশ্চয়ই দাওয়াত খাবার জন্যে খবর দাও নি।

ওরা শুনতে চাইলে একটা গান করবি। এতে অসুবিধা কি?

না। বিয়ের পর আমি গান ছেড়ে দেব।

কেন?

জানি না কেন? আমার মনে হচ্ছে বিয়ের পর আমার গান করতে ইচ্ছা করবে না।

এ রকম মনে হবার কারণ কি?

জানি না।

শায়লা হঠাৎ বললেন, চিত্রা তোর কি কোনো পছন্দের ছেলে আছে?

চিত্রা পায়েস নাড়া বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ আছে।

শায়লা হতভম্ব হয়ে গেলেন। চিত্রা বলল, এ রকম হতাশ চোখে তাকাবার মতো কোনো কিছু না মা। আমার পছন্দের ছেলে আছে শুনে তোমাকে নার্ভাস হতে হবে না। বিয়ে করার মতো কোনো ছেলে না।

তার মানে কি?

চিত্রা সহজ গলায় বলল, কিছু ছেলে আছে যাদের পছন্দ করা যায় কিন্তু বিয়ে করা যায় না।

তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ঐ ছেলে করে কি?

ঐ ছেলেকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না মা। আমি ঐ ছেলের বিষয়ে তোমাকে কোনো কিছু বলব না।

তোর সঙ্গে পড়ে?

চিত্রা জবাব না দিয়ে পায়েসের হাঁড়িতে চামচ নাড়া শুরু করল। শায়লা চিন্তিত মুখে বসে রইলেন। চিত্রাকে এখন কেমন যেন অচেনা লাগছে। কঠিন মেয়ে বলে মনে হচ্ছে।

শায়লা খানিকটা হতাশও বোধ করছেন। তাঁর মেয়ের পছন্দের একজন ছেলে থাকবে। তিনি কখনো তা জানতে পারবেন না, তা কেমন করে হয়?

মীরা রান্নাঘরে ঢুকেছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে যে কোনো কারণেই হোক ভয় পেয়েছে। রাত্রে সে হঠাৎ হঠাৎ ভয় পায়। ভূতের ভয়। ভয় পেলেই ছুটে যেখানে লোকজন আছে সেখানে চলে আসে। শায়লা ছোটমেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হয়েছে?

মীরা বলল, বাবা ফিরেছে মা। কি রকম যেন করছে।

কি রকম করছে মানে?

মনে হচ্ছে আমাকে চিনতে পারছে না। তুমি একটু আসতো মা।

শায়লা উঠে দাঁড়ালেন। চিত্রাও উঠে দাঁড়াল। শায়লা চুলা থেকে পায়েসের হাঁড়ি নামিয়ে রাখলেন। পায়েস যদি পুড়ে যায় তা হবে অলক্ষণ। বিয়ের পায়েস পুড়ে যাওয়া ভালো কথা না।

রহমান সাহেব তাঁর ঘরে খাটেই বসে আছেন। সিগারেট টানছেন। শায়লা ঘরে ঢুকে বললেন, কি হয়েছে?

রহমান সাহেব বললেন, কিছু হয় নি।

শায়লা বললেন, বোনকে তার বাসায় দিয়ে এসেছ?

রহমান সাহেব বললেন, হ্যাঁ।

কোনো সমস্যা হয় নি?

না।

ঘরের মধ্যে সিগারেটের ছাই ফেলছ কি জন্যে? এসট্রে চোখে পড়ছে না?

রহমান সাহেব উঠে টেবিলের উপর থেকে এসট্রে নিলেন। শায়লা বললেন, সিগারেট ফেলে হাত মুখ ধুয়ে এসে ভাত খাও।

রহমান সাহেব সঙ্গে সঙ্গে হাতের আধ-খাওয়া সিগারেট ফেলে দিলেন। তাঁর কাজ কর্ম খুবই স্বাভাবিক। মীরা এখন বাবার স্বাভাবিক আচার আচরণ দেখে অবাক হচ্ছে। অথচ বাবা একটু আগেই খুব অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন। কলিং বেল শুনে মীরা দরজা খুলল। রহমান সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাচুমাচু গলায় বললেন, ভেতরে আসব?

মীরা বিস্মিত হয়ে বলল, এইসব কি কথা বাবা? ভেতরে আস।

তিনি ভেতরে ঢুকে বললেন, কিছু মনে করবেন না। এই বাড়ির লোকজন সব কোথায়?

মীরা হতভম্ব গলায় বলল, বাবা তুমি কি বলছ?

তিনি শূন্য দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মীরা ছুটে গেল রান্না ঘরে। এখন মনে হচ্ছে সবই স্বাভাবিক।

শায়লা রান্নাঘরের দিকে গেলেন। চিত্রা গেল মায়ের সঙ্গে। মীরা এসে বসল বাবার পাশে। মীরা বলল, বাবা সত্যি করে বল তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?

রহমান সাহেব বললেন, পারছি।

বলতো আমি কে?

রহমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, তুই মীরা।

বাবা তুমি এমন অদ্ভুত ভাবে হাসছ কেন?

কই হাসছিনা তো।

রহমান সাহেব হাসতে শুরু করলেন। প্রথমে নিঃশব্দে। তারপর গা দুলিয়ে সশব্দে। তার হাসির দমকে খাট পর্যন্ত নড়তে শুরু করেছে। মীরা কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে ডাকল, মা মা।

শায়লা বানু আবার ঘরে ঢুকলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, কি হয়েছে?

মীরা বলল, বাবা যেন কি রকম করে হাসছে। শায়লা স্বামীর দিকে তাকালেন রহমান সাহেবের হাসি বন্ধ হয়েছে। তিনি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছেন। শায়লা বললেন, বসে আছ কেন? তোমাকে হাত মুখ ধুয়ে খেতে আসতে বললাম না।

রহমান সাহেব বললেন, আসছি।

আসছি না। এখন আস।

রহমান সাহেব বাধ্য ছেলের মতো উঠে দাঁড়ালেন। শায়লা বললেন, আগামীকাল বিকেলে তোমার মেয়ের এনগেজমেন্ট এটা মনে আছে তো?

রহমান সাহেব বললেন, কার এনগেজমেন্ট?

কার এনগেজমেন্ট মানে? তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছ? আমি নানান যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছি। আর যন্ত্রণা বাড়াবে না। তোমার সমস্যা কি?

মাথা ব্যথা করছে।

ভাত খেয়ে মাথা ব্যথার দু'টা ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমতে যাও।

আচ্ছা।

আগামীকাল অফিসে যাবার দরকার নেই। বাড়িতে নানান কাজকর্ম।

আচ্ছা।

বরপক্ষের লোকজনদের সঙ্গে তুমি আগবাড়িয়ে কথা বলতে যাবে না। চুপচাপ বসে থাকবে।

আচ্ছা।

ওরা কোনো প্রশ্ন করলে অল্প কথায় জবাব দেবে। দুনিয়ার ইতিহাস বলা শুরু করবে না।

আচ্ছা।

তোমার অফিসের কেউ কি আসবে?

রহমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কোথায় আসবে?

শায়লা বানু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। তিনি অনেক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। বাড়তি যন্ত্রণা নিতে পারছেন না। তাঁর খুবই বিরক্ত লাগছে। তিনি

বিরক্তি চাপা দিয়ে ভাত বাড়তে গেলেন।

বাবার সঙ্গে চিত্রা খেতে বসেছে। মীরা আগেই খেয়ে নিয়েছে। সে টেলিফোনে কথা বলছে। ঐ টেলিফোনটা এসেছে। মজনু ভাইয়ের টেলিফোন। এখন মীরা গলার স্বরও চিনতে পারছে। মজনু ভাই চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার চেষ্ট করছেন। এতে গলার স্বর ঢাকা পড়ছে না।

মীরা তুমি কি করছ?

টেলিফোনে কথা বলছি।

তোমার গলার স্বর এমন গম্ভীর কেন?

ঠাণ্ডা লেগেছে গলা বসে গেছে।

আগামীকাল তোমাদের বাড়িতে উৎসব।

হ্যাঁ উৎসব। আপনি কি করে জানেন?

জানি। কি করে জানি বলা যাবে না।

আচ্ছা শুনুন আমি কি আপনাকে কখনো দেখেছি?

হ্যাঁ দেখেছ।

আমি কি রোজই আপনাকে দেখি?

হ্যাঁ দেখ।

তারপরেও চিনতে পারছি না?

খুব কাছের মানুষকে চেনা যায় না। শোন মীরা, তুমি আমার সঙ্গে আগে তুমি তুমি করে কথা বলতে আজ আপনি করে কথা বলছ কেন?

জানি না কেন বলছি।

মীরা তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?

না।

কিন্তু তোমার গলার স্বরে রাগ আছে।

থাকলে কিছু করার নেই।

রামী কেমাতো সিবালভা।

তার মানে কি?

উল্টো করে বললাম, রামী কেমাতো সিবালভা মানে হল মীরা তোমাকে ভালবাসি।

ভালো।

বযা রেম লেপে না কেমাতো।

তার মানে কি?

তার মানে হল— তোমাকে না পেলে মরে যাব।

মীরার রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে— বেকুব টাইপ একটা মানুষ। যার প্রধান কাজ বাজার করা আর ঘর ঝাঁট দেয়া সে কেমন মেয়ে পটানোর খেলা শিখেছে। উল্টা কথা বলার খেলা খেলছে। মা'কে এই ব্যাপারটা বলতে হবে। টেলিফোন শেষ করেই মীরা মা'কে বলবে। মা যা করার করুক।

BANGLABOOK.COM

খাওয়া দাওয়া শেষ করে রহমান সাহেব পান মুখে দিয়ে ঘুমুতে গেলেন। চিত্রা গেল তার বাবার সঙ্গে। সে আজ বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করবে। বাবার মধ্যে সে কেমন যেন দিশাহারা ভাব দেখছে। এটা তার ভালো লাগছে না।

সে নিজেও দিশাহারা বোধ করছে। আগামীকাল যে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সেই ঘটনা সম্পর্কে এই বাড়ির কেউ কিছু জানে না। বাবাকে কি এই ঘটনাটা বলা যায়। কিংবা বাবার কাছে কি পরামর্শ চাওয়া যায়। জটিল সমস্যায় পরামর্শ দেবার ক্ষমতা কি বাবার আছে?

রহমান সাহেব শুয়ে পড়েছেন। চিত্রা বাবার পাশে বসেছে। চিত্রা বলল, বাবা তোমার মাথা ব্যথা কি কমেছে?

হ্যাঁ।

না কমলে বল— আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দেব।

রহমান সাহেব খুবই অস্বস্তির সঙ্গে বললেন— না, না লাগবে না।

চিত্রা বলল, তুমি এত অস্বস্তি বোধ করছ কেন? মেয়ে তার বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে এতে অস্বস্তির কি আছে?

মাথা ব্যথা নেই। যা তুই ঘুমুতে যা।

যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করি। বিয়ের পর তো আর গল্প করার সুযোগ হবে না। না-কি তোমার ঘুম পাচ্ছে?

ঘুম পাচ্ছে না।

চিত্রা মাথা দুলাতে দুলাতে বলল— এ বাড়ির কেউ জানে না, কাল কিন্তু শুধু এনগেজমেন্ট হবে না। বিয়ে হয়ে যাবে।

ও আচ্ছা।

তুমি এমনভাবে ও আচ্ছা বললে— যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তুমি যে খুবই অদ্ভুত মানুষ এটা বোধহয় তুমি জান না।

রহমান সাহেব হাসলেন। চিত্রা বলল, আহসান টেলিফোনে এই খবরটা

আমাকে দিয়েছে। ওরাই কাজি নিয়ে আসবে। এনগেজমেন্টের পর পরই আহসানের বড়চাচা প্রস্তাবটা তুলবেন। বিয়ে হয়ে যাবে। শুধু যে বিয়ে হবে তাই না। বিয়ের পর ওরা সেদিনই আমাকে নিয়ে যাবে।

আহসান কে?

আশ্চর্য কথা বাবা আহসান কে মানে? তুমি জান না আহসান কে?

না।

যার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে তার নামই আহসান।

ও আচ্ছা।

ঘটনাটা আমি শুধু তোমাকে বললাম। এদিকে আমি গোপনে গোপনে কি করেছি জান?

না।

আমি আমার প্রয়োজনীয় সব জিনিস স্যুটকেসে ঢুকিয়ে ফেলেছি। এমন ভাবে ঢুকিয়েছি যেন মা কিছু বুঝতে না পারেন। ভালো করেছি না বাবা?

হ্যাঁ ভালো করেছিস।

শ্বশুর বাড়িতে যাব অথচ আমার নিজের একটা তোয়ালে থাকবে না। ওদের তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে। এটা ঠিক না। বাবা তোমার মনে হয় ঘুম পাচ্ছে। ঘুমাও।

আচ্ছা।

বাতি নিভিয়ে দেব বাবা?

হ্যাঁ।

চিত্রা বাতি নিভিয়ে দিল। চলে যাবার আগে সে কিছুক্ষণ বাবার কপালে হাত রাখল। কপাল গরম হয়ে আছে। মনে হচ্ছে তাঁর জ্বর আসছে। চিত্রা বাবার গায়ে চাদর টেনে দিল।

ফরিদা অনেক রাত পর্যন্ত তার ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাইজান তাকে ফেলে চলে গিয়েছে এ জন্যে তার শুরুতে খুব মন খারাপ হয়েছিল। মন খারাপ ভাবটা অতি দ্রুত চলে গেল। তার কাছে মনে হল— আহারে বেচারা। বোনকে ফেলে চলে যেতে হচ্ছে এরচে কষ্টের আর কি আছে। এই লজ্জা বেচারাকে সারাজীবন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। হয়তো বোনের বাসায় সে আর কোনোদিন আসবেও না। বেচারার এটা সেটা খাবার শখ। যখনই কিছু খেতে ইচ্ছা হয় বাজার করে নিয়ে আসে। এমন এক ভাব করে যেন বাজারটা সে করেছে তার বোনের জন্যে। সপ্তায় তিনদিন সে আসবেই। এসে যে গল্প গুজব করবে তা-না। চুপচাপ বসে থাকবে। খবরের কাগজ পড়বে। দু'দিন আগের খবরের কাগজ দিলেও সমস্যা নেই। গভীর মনযোগে সেটাই পড়ছে। কারোর সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। এ রকম মানুষ কয়টা হয়? নিজের জন্যে না, ফরিদার কষ্ট হতে লাগল তার ভাইজানের জন্যে।

ফরিদার পানির পিপাসা খুব বেড়েছে। নিজের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে একবার কি সে বলবে— পানি খাব। ঘরে ঢুকব না। বারান্দায় দাঁড়িয়েই খাব।

অতি পাষণ্ডও তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানি দেয়। জহির নিশ্চয়ই এত পাষণ্ড না। ফরিদা সাহস পাচ্ছে না। ঘরের ভেতর তাস খেলা হচ্ছে। জহিরের বন্ধু-বান্ধব চলে এসেছে। মাঝে মাঝে হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হাসির ধরন থেকে বোঝা যাচ্ছে মদ খাওয়া হচ্ছে। মাতাল মানুষ কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। হয়তো বন্ধুদের সামনেই চড় বসিয়ে দিবে। চড় থাপ্পড় দেয়ার অভ্যাস এই মানুষটার আছে। রেগে গেলে তার হুঁশ থাকে না।

ফরিদার মনে হল তার উচিত রাগ পড়ার সুযোগ দেয়া। তাস টাস খেলে মনটা ভালো হোক। রাতে আরাম করে ঘুমাক। সকালবেলা ঘরে ঢোকার আরেকটা চেষ্টা করা যাবে। শুরুতে ফরিদার মনে হচ্ছিল রাত কাটানোটা খুব সমস্যা হবে।

তার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসেছে। ছাদে গিয়ে বসে থাকলেই হয়। এত রাতে কারোরই ছাদে আসার সম্ভাবনা নেই। তারপরেও কেউ যদি আসে সে বলবে— খুব গরম পড়ছে, ঘরে ঘুম আসছে না। তাই ছাদে হাঁটছি।

তবে রাতে বৃষ্টি নামতে পারে। বৃষ্টি নামলেও সমস্যা নেই, ছাদের সিঁড়ি ঘরে বসে থাকবে। ফরিদা ছাদে উঠে গেল। ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদ সুন্দর থাকে না। কাপড় শুকানোর জন্যে একেক ফ্ল্যাটের মালিক একেক জায়গায় দড়ি টানায়। ছাদটা হয়ে থাকে জালের মতো। ছাদে উঠে ফরিদার ভালো লাগল। একটু করে এগুচ্ছে একটা দড়ি হাত দিয়ে ছুঁচ্ছে। এক ধরনের খেলা। ছাদের রেলিং ধরে সে নিচে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঘুরে উঠল। কি ভয়ঙ্কর। তার হাইট ফোবিয়া আছে। দোতলার বারান্দা থেকে সে নিচে তাকাতে পারে না আর এখন সে দাঁড়িয়ে আছে— পাঁচ তলা বাড়ির ছাদে।

এত উঁচু থেকে নিচে তাকানোর ফলে আরো একটা ঘটনা ঘটল— ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ভালো লাগাটা বাড়ল। সে এখন যে কোনো সময় ছাদ থেকে লাফ দিতে পারে। এই জীবনের সমস্ত সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সমাধান। কারোর যদি বড় ধরনের কোনো অসুখ হয় এবং সেই অসুখের ওষুধ হাতে থাকে তাহলে তৃপ্তির যে ভাবটা হয় ফরিদার তাই হচ্ছে। তার জীবনে অনেক সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান এখন তার হাতে আছে। সমাধান হাতে নিয়ে সে ঘুরছে। বাহ্ কি আনন্দ! রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত সময় আছে। যা করার সে ভোর রাতে করবে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত সে ছাদে হাঁটাহাটি করবে।

যদি ছাদ থেকে লাফ দেয়ার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত সে নিয়ে ফেলে তাহলে অবশ্যই কয়েকটা চিঠি লিখে যেতে হবে। চিঠিগুলি পলিথিন মুড়ে সঙ্গে রাখতে হবে। ছাদ থেকে লাফ দেয়ার ফলে শরীর থেতলে রক্ত বের হবে। চিঠিগুলি পলিথিনে মোড়া না থাকলে রক্ত মেখে মাখামাখি হবে। কেউ পড়তেই পারবে না। সে একটা চিঠি লিখবে বাবুকে, একটা লিখবে চিত্রাকে এবং সব শেষ চিঠিটা জহিরকে।

বাবুর চিঠিটা সবচে ছোট। সেখানে লেখা থাকবে—

বাবু টিনটিন
বাবু রিনঝিন
যায়রে
বাবু ফিরে ফিরে চায়রে।

এই ছড়াটা ফরিদার নিজের বানানো। বাবু যখন ছোট ছিল তখন ফরিদা

বানিয়েছে। ছোটবেলায় এই ছড়া বলে বাবুর গায়ে কাতুকুতু দিলে সে খুব হাসত। এখন বাবু বড় হয়েছে গম্ভীর ভঙ্গিতে স্কুলে যায়— তারপরেও এই ছড়াটা ফরিদা যখনই বলে বাবু শত গাম্ভীর্যের মধ্যেও ফিক করে হেসে ফেলে। বাবু নিশ্চয়ই তার মা'র লিখে যাওয়া শেষ ছড়াটা যত্ন করে রেখে দেবে। সে যখন বড় হয়ে চাকরি বাকরি করবে তখন দামি একটা ফ্রেমে ছড়াটা সাজিয়ে দেয়ালে টানিয়ে রাখবে। তার একদিন বিয়ে হবে, বউ আসবে সংসারে। নতুন বৌ আগ্রহ নিয়ে বলবে— এটা কি টানিয়ে রেখেছ? ছড়া না? ছড়া বাঁধিয়ে রেখেছ কেন? বাবু গম্ভীর গলায় বলবে— তুমি বুঝবে না। খবর্দার ওখানে হাত দেবে না। মা'র কথা সে নিশ্চয়ই প্রথম দিনেই নতুন বউকে বলবে না। "আমার মা পাঁচতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন" এই কথা নতুন বউয়ের সঙ্গে প্রথম দিনেই আলাপ করা যায় না।

দ্বিতীয় চিঠিটা সে লিখবে চিত্রাকে। চিত্রা মেয়েটা তার খুব পছন্দের। চিত্রা এই পছন্দের ব্যাপারটা জানে না। পছন্দের ব্যাপার গোপন থাকাই ভালো। সে চিত্রাকে লিখবে—

> মা চিত্রা, আজ তোর এনগেজমেন্ট। কি শুভ একটা দিন। এই শুভদিনে— অশুভ সংবাদ আসা ঠিক না। কিন্তু মা, কি করব বল— আমার কোনো উপায় ছিল না। এনগেজমেন্ট উপলক্ষে তোর জন্যে একটা শাড়ি কিনেছিলাম। শাড়িটা তোদের বাসায় রেখে এসেছি। কোনো এক সময় পরবি। কেমন মা? তোর বিয়েতে উপহার দেবার জন্যে কানের দুল কিনেছি। সেটা রাখা আছে আমার শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের সবচে নিচের ড্রয়ারে। ড্রয়ারে তালা দেয়া। তালার চাবিটা আমার বিছানার তোষকের নিচে। তোষক অল্প একটু তুললে কিন্তু পাবি না। অনেকটা তুলতে হবে। ভেতরের দিকে রেখেছি।
>
> মা'রে মাছের তেলে মাছ ভাজা বলে যে ব্যাপারটা আছে, তোর উপহার কেনার মধ্যে এই ব্যাপারটা আছে। অনেক আগে তোর মা'র একটা গয়না আমি চুরি করেছিলাম। ঐটা বিক্রি করেই তোর শাড়ি, কানের দুল কেনা হয়েছে। তোর একটা মাত্র ফুপু সে আবার মিসেস চুরনি। তোর নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে। মা'রে অভাবে পড়ে আমার এই বিশ্রী অভ্যাস হয়েছে। সোনার দোকানে নিজের গয়না বিক্রি করতে যেতাম। সেখানেই অন্য গয়না দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা সরিয়ে ফেলতাম। অভাব খুব খারাপ জিনিস মা।

তুই তোর বাবার দিকে একটু লক্ষ্য রাখিস। আমার ধারণা আমি না বললেও তুই রাখবি। বিয়ের আগে মেয়েরা লক্ষ্য রাখে তার মা'র দিকে। বাবার দিকে চোখ পড়ে না। বিয়ের পর সে যখন একজন পুরুষের সঙ্গে বাস করতে যায় তখন তার বাবার কথা মনে পড়ে। চিত্রা মা যতই দিন যাচ্ছে তোর বাবা কেমন যেন আউলা ঝাউলা হয়ে যাচ্ছে। এমনভাবে সে তাকায় যেন তার কিছুই নেই। তুই অবশ্যই মাঝে মাঝে আদর করে তাকে দু'একটা কথা বলবি। এটা সেটা রান্না করে খাওয়াবি। এতেই দেখবি মানুষটা কত খুশি হবে। কিছু কিছু মানুষ আছে অল্পতে খুশি হয়— কোনো কিছু না পেয়েই খুশি হয়। তোর বাবা সে রকম একজন মানুষ। মানুষটা ডুবে যাচ্ছে। তুই অবশ্য তাকে টেনে তুলবি।

শেষ চিঠিটা লিখতে হবে জহিরকে। এইখানে ফরিদা একটা কায়দা করবে। আমার মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী এইসব কিছুই লিখবে না। উল্টা ভালো ভালো কথা, মিষ্টি মিষ্টি কথা লিখবে। যাতে চিঠি পড়ে সে একটা ধাক্কার মতো খায়। অন্তত একবার হলেও নিজের মন থেকে বলে— আহারে! মন থেকে কেউ আহারে বললে— সেই আহারে মনের ভেতর ঢুকে যায়। কিছু দিন পরপর সেই আহারে মনের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে— ফিসফিস করে বলে— আহারে! আহারে! আহারে!

BANGLABOOK.COM

জহিরকে সে লিখবে—

তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব রাগ করছ। আমার মাথাটা ঠিক নেই তো এই জন্যে বোকার মতো এই কাজটা করলাম। তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে এই কষ্টটা আমি নিতে পারছি না। এ জীবনে আমি যে ক'টি ভালো মানুষ দেখেছি তুমি তাদের মধ্যে একজন। অনেক পূণ্য বলে আমি তোমার মতো স্বামী পেয়েছি। কিন্তু সম্পূর্ণই আমার নিজের দোষে তোমার সঙ্গে থাকতে পারছি না। এই কষ্ট কোথায় রাখি? তুমি ভালো থেকো। শরীরের যত্ন নিও। বাবুকে দেখো। দেখে শুনে দুঃখী দুঃখী টাইপ একটা মেয়েকে বিয়ে করো যাতে সে বাবুকে ভালোবাসে। যাই কেমন?

ইতি
তোমার অতি আদরের ফরিদা

ফরিদা নিজের মনে কিছুক্ষণ হাসল। এই চিঠি পড়ে জহিরের মুখের ভাব কি হবে ভেবেই মজা লাগছে। এখন চিঠিগুলি লিখে ফেলতে হবে। অন্ধকারে চিঠি লেখা যায় না। চিলেকোঠার ঘরে বাতি জ্বলছে, কাজেই আলোর সমস্যা নেই। চিঠি লেখার জন্যে বল পয়েন্ট তার হ্যান্ড ব্যাগেই আছে। বাজারের ফর্দ লেখার জন্যে একটা ছোট্ট প্যাডও আছে। প্যাডটা সে কিনেছে ধানমন্ডির হলমার্কের দোকান থেকে। প্যাডের কভারে মীন রাশির ছবি। ফরিদার মীন রাশি বলেই সে এই প্যাড কিনেছিল। প্যাডটা এত সুন্দর যে কিছু লেখা হয় নি। মনে হয়েছে কিছু লেখা মানেই প্যাডটা নোংরা করা। চিঠি লেখার সব কিছুই তার কাছে আছে। শুধু পলিথিন নেই। তার প্রয়োজনও নেই। চিঠিগুলি হ্যান্ড ব্যাগে রেখে ব্যাগের মুখ শক্ত করে বন্ধ করে দিলেই হবে। তাহলেই আর ব্যাগের ভেতর রক্ত ঢুকবে না।

ফরিদার তৃষ্ণা খুব বেড়েছে। বুক ভর্তি তৃষ্ণা নিয়ে ছাদ থেকে ঝাঁপ দেয়ার কোনো অর্থ হয় না। ঝাঁপ দেবার আগে দু'গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে নেয়া দরকার। আরেকবার তার নিজের ফ্ল্যাটে গেলে কেমন হয়? জহিরকে সে বলবে দু'গ্লাস পানি দিতে।

ফরিদা তার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্ল্যাটের বাতি জ্বলছে না, হৈচৈও শোনা যাচ্ছে না। খেলা বন্ধ করে লোকজন চলে গেছে। জহির হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কলিং বেল টিপে তার ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে কি না ফরিদা বুঝতে পারছে না। কাঁচা ঘুম ভাঙলে জহির খুব রেগে যায়। উল্টাটাও হতে পারে— হঠাৎ ঘুম ভাঙলে মানুষ ঘোরের মধ্যে থাকে। আগের কোনো কিছুই মনে থাকে না। এই অবস্থায় দরজা খুলে জহির তাকে দেখে হয়তো কিছুই বলবে না। ফরিদা স্বাভাবিকভাবে ঘরে ঢুকতে পারবে। ঘরে ঢুকে সে যা করবে তা হচ্ছে পানি গরম করতে দেবে। গরম পানি দিয়ে আরাম করে গোসল। গোসলের পর এক কাপ গরম চা। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়া। এর মধ্যে যদি জহিরের ঘুম পুরোপুরি ভেঙে যায় এবং সে যদি বিশেষ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় তাহলে জহিরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে যাবে। শরীরের ভালোবাসা তুচ্ছ করার বিষয় না। শরীর বেশির ভাগ সময় মনের সমস্যা ভুলিয়ে দেয়।

ফরিদা কলিং বেল টিপল। সে ঠিক করে রেখেছিল পর পর পাঁচবার কলিং বেল টিপবে। এই পাঁচবারে যদি দরজা না খুলে তাহলে সে ছাদে চলে যাবে। চারবারের বার দরজা খুলে গেল। জহির তার দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল, চাস কি?

ফরিদা বলল, কিছু চাই না।
জহির চাপা গলায় বলল, চলে যেতে বলেছি— চলে যা।
কোথায় যাব?
যেখানে ইচ্ছা যা। কোনো পার্কে চলে যা। ব্যবসা কর। রিকশাওয়ালা ঠেলাওয়ালারা আছে এরা পাঁচ টাকা দশ টাকা করে দিবে।
তুমি এইসব কি বলছ?
যা বলছি ঠিকই বলছি।
মদ খেয়ে তোমার মাথা ঠিক নেই। তুমি কি বলছ নিজেই জান না।
জহির শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিল। ফরিদার তেমন কষ্ট হল না। অদ্ভুত কারণে তার পানির তৃষ্ণাটা চলে গেছে। সে আবার ছাদে উঠে গেল। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। হাতে সময় বেশি নেই। চিঠিগুলি লিখে ফেলা দরকার।

এনগেজমেন্টের দিনই চিত্রার বিয়ে হয়ে যাবে এই খবরটা গোপন রইল না। সকাল আটটায় চিত্রার খালা উত্তরা থেকে টেলিফোন করলেন। টেনশানে তাঁর হাঁপানির টান উঠে গেছে। বুকে ব্যথা হচ্ছে, কপালে ঘাম জমছে। তাঁর ধারণা অধিক উত্তেজনার কারণে তাঁর স্ট্রোক করতে যাচ্ছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, শায়লা খবর শুনেছিস।
শায়লা বললেন, কি খবর?
চিত্রা তোকে কিছু বলে নি?
না তো।
চিত্রাতো ডেনজারাস মেয়ে! এত বড় একটা খবর তোকে কিচ্ছু বলে নি?
খবরটা কি আপা?
খবরটা শোনার পর থেকে আমার শরীর কেমন যেন করছে। স্ট্রোকের আগে যে সব লক্ষণের কথা ডাক্তাররা বলেন তার সব কটা লক্ষণ এখন আমার মধ্যে, কপাল ঘামছে। ডান হাত ব্যথা করছে। বেশির ভাগ লোকের ধারণা বাম হাত ব্যথা করা হার্ট এটাকের লক্ষণ— আসলে কিন্তু বাম হাত না, ডান হাত। আমি এখন ডান হাতের আঙুল পর্যন্ত বাঁকা করতে পারছি না।
শায়লা চুপ করে রইলেন। তাঁর বড় আপার এই সমস্যা— মূল বিষয়ে যাবার আগে এদিক ওদিক যেতে থাকবেন। মূল বিষয় চাপা পড়ে থাকবে। বোঝা যাচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। বরপক্ষীয়রা কি মত বদলেছে? শেষ মুহূর্তে বলছে— আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে ছেলের কিছু আত্মীয়স্বজন বিদেশ থেকে এসে পৌঁছায় নি। কাজেই বৃহস্পতিবার এনগেজমেন্টটা হবে না। আমরা পরে আপনাদের ডেট জানিয়ে দেব।
শায়লা মনের উত্তেজনা অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করলেন, বড় আপা কি হয়েছে বল তো? এনগেজমেন্টটা কি সত্যি হচ্ছে?

তুই এনগেজমেন্টের কথা ভুলে যা।

শায়লার বুক ধক করে উঠল। মনে হল সে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে।

চিত্রার বড় খালা বললেন, এনগেজমেন্টের কথা মাথা থেকে দূর করে দে। এনগেজমেন্ট ফেনগেজমেন্ট না। ঐ দিন বিয়ে হচ্ছে।

কি বললে?

ওরা কাজি নিয়ে আসছে ঐ দিন বিয়ে পড়ানো হবে।

কি বলছ তুমি?

ওরা চিত্রার সঙ্গে এই বিষয়ে কথাও বলেছে। চিত্রার কোনো আপত্তি নেই।

কবে চিত্রার সঙ্গে কথা বলেছে?

এত কিছু তো আমি জিজ্ঞেস করি নি। তুই তোর মেয়েকে ডেকে শক্ত করে একটা ধমক দে। জরুরি খবরগুলি সে দেবে না? চিত্রা বিয়ের কনে না হলে আমি তোদের বাড়িতে এসে কষে একটা চড় লাগাতাম।

সত্যি বিয়ে হচ্ছে আপা?

সত্যি তো বটেই। ওরা বিয়ে পড়িয়ে রাতেই বউ নিয়ে চলে যাবে। চিত্রার সঙ্গে এ বিষয়েও ওদের কথা হয়েছে। চিত্রার আপত্তি নেই।

কি বলছ তুমি?

যা সত্যি তাই বলছি। তোর হাতে শুধু আজকের দিনটা সময় আছে। যা করার করে ফেল।

BANGLABOOK.COM

কি করব?

সেটাও তো বুঝতে পারছি না, কি করবি। আচ্ছা আমি চলে আসছি। একটা ইসিজি করিয়ে তারপর আসব। আমাদের বাড়ির একতলার ভাড়াটে— বাড়িতে মিনি ক্লিনিক খুলেছে। ইসিজি-ফিসিজি সবই আছে। পাঁচশ টাকা করে ইসিজিতে নেয়। আমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই নেবে না।

চিত্রার বড় খালা কথা বলেই যাচ্ছেন। হার্টের অসুখ সংক্রান্ত নানান কেচ্ছা কাহিনী। কার কবে খালি বাড়িতে হার্ট এটাক হল। সে নিজে ডাক্তার হয়েও মনে করল গ্যাসট্রিকের ব্যথা। এন্টাসিড খেয়ে ঘরে বসে টিভিতে কৌন বনে গা ক্রোড়পতি দেখছে। হার্ট এটাকের উত্তেজনা আর কৌন বনে গা ক্রোড়পতির উত্তেজনা দু'টায় ডাবল একশন। এক ধাক্কায় শেষ। শায়লা বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। টেলিফোন বকবকানি শোনার সময় তাঁর নেই। দুনিয়ার কাজ পড়ে আছে। অথচ মুখের ওপর টেলিফোন রাখাও যাচ্ছে না।

শায়লা!

বল আপা।

চিত্রার কিছু কাপড় চোপড় ব্যবহারি জিনিসপত্র গুছিয়ে স্যুটকেসে দিয়ে-দে। সে নিশ্চয়ই একবস্ত্রে শ্বশুর বাড়িতে যাবে না। ভালো স্যুটকেস আছে?

না।

কাউকে নিউমার্কেটে পাঠিয়ে দে, ইন্ডিয়ান স্যামসোনাইট কিনে নিয়ে আসুক। মিডিয়াম সাইজ স্যুটকেস হাজার দুই টাকা পড়বে। দেখতে খারাপ না। কামাল আতাতুর্ক মার্কেটে বিদেশীটা পাওয়া যাবে। তবে সেকেন্ড হ্যান্ড হবার সম্ভাবনা। সেকেন্ড হ্যান্ড স্যুটকেস কেনার দরকার কি?

আচ্ছা। আপা আমি এখন যাই— আমার মাথা ঘুরছে।

শায়লা টেলিফোন রেখে খাবার ঘরের দিকে এগুলেন। রহমান সাহেব কাপড় পরছেন। রাতে তাঁর চেহারায় যে অস্বাভাবিকতা ছিল, এখন তা নেই। শায়লা বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

রহমান সাহেব বললেন, কোথায় আর যাব? অফিসে যাচ্ছি।

তুমি বোধ হয় জান না, আজ চিত্রার এনগেজমেন্ট হবে না। সরাসরি বিয়ে হয়ে যাবে।

জানি।

শায়লা অবাক হয়ে বললেন, জান মানে? কে বলেছে?

চিত্রা বলেছে। ও তার স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছে।

শায়লা বানু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মেয়ে তাঁকে কিছুই বলে নি অথচ ঠিকই তার বাবাকে বিয়ের খবর দিয়েছে। স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছে। হয়তো দেখা যাবে মীরাও সব জানে। শুধু তিনিই কিছু জানেন না।

শায়লা বললেন, আজ তোমার অফিসে যাবার দরকার নেই।

ছুটি নিয়ে আসিনি তো।

মেয়ের বিয়ের জন্যে একদিন অফিস কামাই করতে পারবে না? এমনই কঠিন তোমার অফিস? খবর্দার তুমি অফিসে যাবে না।

রহমান সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আমি অফিসে গিয়ে ছুটি নিয়ে আসি? এক ঘণ্টা লাগবে। যাব আর আসব।

যেতেই হবে?

এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসব।

শায়লা তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে চিত্রার খোঁজে গেলেন। যে মেয়ের আজ বিয়ে হয়ে যাচ্ছে সেই মেয়েকে কঠিন কোনো কথা বলা মোটেই

ঠিক হবে না। তারপরেও তিনি জানতে চাইবেন— এত বড় একটা খবর তাকে না দিয়ে সে তার বাবাকে কি কারণে দিল। হঠাৎ করে তিনি কেন এত গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেন?

চিত্রা সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। খুব বেশি সাজগোজ সে কখনো করে না। আজ একটু সেজেছেও। ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়েছে। চোখে কাজল। গালে হালকা পাউডার। মনে হচ্ছে সে বাইরে কোথাও যাচ্ছে, তারই প্রস্তুতি।

শায়লা অবাক হয়ে বললেন, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

চিত্রা বলল, যেখানেই যাই এগারোটার আগেই চলে আসব মা।

শায়লা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তুই এগারোটায় আসবি না, রাত দশটায় আসবি তা তো জানতে চাচ্ছি না। আমি জানতে চাচ্ছি তুই যাচ্ছিস কোথায়?

BANGLABOOK.COM

বন্ধুর বাসায় যাচ্ছি।

আজ তুই কোথাও বের হতে পারবি না।

কেন?

বিয়ের দিন কনে ঘর থেকে বের হতে পারে না। নিয়ম নেই।

চিত্রা হাসি মুখে বলল, পুরনো কালের নিয়ম-কানুন এখন কেউ মানে না মা। বিয়ের দিন কনেকে ঘর থেকে বের হতে হয়। পার্লারে গিয়ে চুল বাঁধতে হয়।

আমি তোর সঙ্গে তর্ক করতে পারব না। তুই ঘর থেকে বের হবি না।

মা আমিও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারব না। আমাকে যেতেই হবে। খুবই জরুরি।

যেতেই হবে?

হ্যাঁ, যেতেই হবে। আমাকে ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি যাবই।

শায়লা আহত গলায় বললেন, তাহলে অপেক্ষা কর তোর বড় খালা আসুক। বড় খালার গাড়ি নিয়ে যাবি। তোর সঙ্গে মীরা যাবে।

মীরা কি আমার পাহারাদার?

তুই যা ভাবার ভেবে নে। মীরা অবশ্যই তোর সঙ্গে যাবে।

মা শোন, তুমি রেগে যাচ্ছ। রেগে যাবার মতো কিছু হয় নি। আমি বড় খালার গাড়ি নিয়ে কোথাও যাব না। রিকশা নিয়ে যাব। এবং অবশ্যই মীরাকে সঙ্গে নেব না। তুমি শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছ।

আমি ভয় পাব কেন?

অবশ্যই তুমি ভয় পাচ্ছ। ভয়ে তোমার চোখ ছোট হয়ে গেছে। ভয়টা দূর কর মা। গল্প উপন্যাসে দেখা যায়— যে দিন বিয়ে সেদিন সকালবেলা মেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে অন্য একটা ছেলেকে বিয়ে করে। এই কাজ আমি কখনো করব না। আমি যখন বলছি এগারোটার মধ্যে ফিরব। অবশ্যই ফিরব। এখন আমাকে একটু সাহায্য কর তো মা, দেখ তো টিপটা যে দিয়েছি টিপটা কি মাঝখানে হয়েছে?

শায়লা কিছু না বলে চলে গেলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। চোখের পানি তিনি মেয়েকে দেখাতে চাচ্ছেন না। তাঁর খুবই মন খারাপ লাগছে। সংসারে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় এবং তুচ্ছ মনে হচ্ছে। অথচ তিনি একা সংসারকে বুকে আগলে এই অবস্থায় এনেছেন।

মীরা আজ স্কুলে যায় নি। শায়লা তাকে স্কুলে যেতে নিষেধ করেছেন। ঘরে নানান কাজকর্ম আছে। মীরার সাহায্য দরকার। অথচ মীরা কাজ করার কিছু পাচ্ছে না। সব কাজকর্ম আগেই গোছানো। কাজ খুঁজে নিয়ে কাজ করার মতো মেয়ে মীরা না। তার ইচ্ছা করছে গল্পের বই নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে পড়তে শুরু করা। এই কাজটা করার সাহস হচ্ছে না। মা খুব রাগ করবেন। বেশি রেগে গেলে হাত থেকে টান দিয়ে বই ছিঁড়ে ফেলবেন। মীরা ঘর থেকে বের হল। তার হাতে শীর্ষেন্দুর একটা বই— ঘুনপোকা। বারান্দার কোনো আড়াল বের করে বই পড়তে শুরু করতে ইচ্ছা করছে। বাগান বিলাস গাছটার আড়ালে বসা যায়। বাগান বিলাসের আড়ালে বসলে চট করে মা তাকে দেখতে পাবেন না। অথচ মা ডাকলেই সে শুনতে পাবে। তবে গাছ ভর্তি শুয়োপোকা। গায়ে শুয়োপোকা না উঠলেই হল।

মীরা কি করছ?

মীরা চমকে উঠল। মজনু ভাই। নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে চমকে দিয়েছে। মীরা গম্ভীর গলায় বলল, কি ব্যাপার?

তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।

কি জিনিস?

কাঁঠালচাপা ফুল। তীব্র গন্ধ। শাহবাগের মোড়ে বিক্রি করছিল দু'টাকা পিস। আমি দরদাম করে তিনটা কিনেছি পাঁচ টাকায়। ফুলটার এমন গন্ধ— আধমাইল দূর থেকে পাওয়া যায়।

মীরা একবার ভাবল ফুল নেবে না। তারপরেও নিল।

মজনু বলল, একটা গ্লাস ভর্তি করে পানি নাও— তার ওপর ফুলগুলি দিয়ে রাখ— দেখ কি গন্ধ হয়। দেখবে গন্ধে মাথা ধরে যাবে।

যে গন্ধে মাথা ধরে যায় সেই গন্ধ শুঁকে লাভ কি?

কথার কথা বললাম, গন্ধে তো আর সত্যি মাথা ধরে না।

মীরা বলল, আচ্ছা মজনু ভাই, আপনি কি আমাদের বাসার টেলিফোন নাম্বার জানেন?

মজনু বলল, হ্যাঁ জানি। তোমাদের টেলিফোন নাম্বার জানি। চিত্রার মোবাইল টেলিফোনের নাম্বারও জানি। কখন কোন দরকার হয়। চিত্রার আজ এনগেজমেন্ট না?

হুঁ।

চাচিকে বল যে আমি আজ সারাদিন ফ্রি করে রেখেছি। যে কোনো কাজে আমি আছি। আমার পরিচিত এক ডেকোরেটর আছে— তাকে বলতেই আধঘণ্টার মধ্যে মরিচ বাতি দিয়ে গেট সাজিয়ে দেবে। অন্যেরা যা নেয় তার অর্ধেক চার্জ করবে। যাও চাচিকে জিজ্ঞেস করে এসো।

মা মরিচবাতির গেট করাবে না। কাজেই জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।

তবু জেনে আস। প্লেট থালা জগ এইসব লাগবে কি-না। তার কাছে সব লেটেস্ট ডিজাইনের থালা বাসন।

মীরা বলল, মজনু ভাই আপনাকে একটা উপদেশ দেই শুনুন। আজ মা'র মেজাজ খুবই খারাপ। আপনি দয়া করে মা'র সামনে পড়বেন না। উনি আপনার ওপর রেগে আছেন।

আমার ওপর রেগে আছেন কেন?

আপনি খুব ভালো করেই জানেন কেন? আপনি প্রায়ই বাসায় টেলিফোন করেন। করেন না?

মজনুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে চোখ নামিয়ে নিল। এতক্ষণ সে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই মীরার সঙ্গে কথা বলছিল। এখন আর বলতে পারছে না। তার কপাল ঘামছে।

মীরা বলল, নিজের পরিচয় না দিয়ে দিনের পর দিন টেলিফোন করা কি ঠিক?

মজনু বলল, ঠিক না।

কেন আপনি টেলিফোন করেন?

মজনু বলল, তুমি টেলিফোনে খুব সুন্দর করে হ্যালো বল। এটা শোনার

জন্যে কথা বলি। তুমি হ্যালো বলার পরই আমি টেলিফোন রেখে দেই।

মীরা কঠিন গলায় বলল, বাজে কথা বলবেন না। আপনি হড়বড় করে অনেক কথা বলেন। নিজের নাম মজনু, আমাকে লাইলী বানিয়ে প্রেমের রেলগাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। আমি বোকা মেয়ে না। আমার সঙ্গে চালাকি করতে যাবেন না।

মজনু ফিসফিস করে বলল, আর কোনোদিন টেলিফোন করব না।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে শায়লা বের হয়ে এলেন। তিনি মেয়ের হাতের কাঁঠালচাঁপা ফুল দেখলেন, মজনুকে দেখলেন। আতি দ্রুত দুই এর সঙ্গে দুই যোগ করে চার করলেন। মজনুর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, মজনু তোমার ভাই নিজাম সাহেব কি অফিসে চলে গেছেন না এখনো বাসায় আছেন?

মজনু চাপা গলায় বলল, বাসায় আছেন।

তুমি তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দাও তো। আমার দরকার আছে।

মজনু মনে হল হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে প্রায় দৌড়ে গেল তার ভাইকে খবর দিতে।

ভাড়াটে হিসেবে নিজাম সাহেবকে শায়লা পছন্দ করেন। চুক্তিপত্রে আছে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভাড়া দিতে হবে, নিজাম সাহেব তিন তারিখের আগেই বাড়ি ভাড়া শোধ করে দেন। বাড়ির টুকিটাকি রিপেয়ারিং এর জন্যে বাড়িওয়ালার কাছে ধন্না দেন না। নিজেই মিস্ত্রী ডাকিয়ে সারিয়ে নেন। গত মাসে মিস্ত্রি ডাকিয়ে কলের লিক সারালেন। এবং মিস্ত্রিকে নিয়ে শায়লার কাছে এসে বললেন, ভাবী আপনাদের পানির কলে কোনো সমস্যা থাকলে সারিয়ে নিন। আমার চেনা মিস্ত্রী। ভালো কাজ করে। এ রকম ভাড়াটে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

নিজাম সাহেব বসার ঘরে ঢুকে হাসি মুখে বললেন, ভাবী কোথায়? অফিসে যাবার মুখে জরুরি তলব। ভাড়া বাড়াচ্ছেন না-কি?

শায়লা বললেন, চা খাবার জন্যে ডেকেছি ভাই। ভাপা পিঠা করেছি। ভাপা পিঠা দিয়ে এক কাপ চা খান।

বাড়ি ভাড়া তাহলে বাড়ছে না? যাক বাঁচলাম। আপনার মেয়ের না-কি আজ এনগেজমেন্ট?

শায়লা বললেন, আপনার মেয়ে বলছেন কেন ভাই? মেয়ে তো আপনারও।

নিজাম সাহেব বললেন, আপনি খুবই ভাগ্যবতী মহিলা। আমার স্ত্রীর কাছে ছেলে সম্পর্কে শুনেছি। ভাগ্যগুণেই শুধু এমন ছেলে পাওয়া যায়।

দোয়া করবেন ভাই।

অবশ্যই দোয়া করি। খাস দিলে দোয়া করি।

আপনি কিন্তু আমার মেয়ের এনগেজমেন্টের সময় উপস্থিত থাকবেন। অফিস শেষ করে সোজা বাসায় চলে আসবেন।

রোজই তো তাই আসি। আজ না হয় আরো ঘন্টাখানিক আগে চলে আসব। আর মজনুকে বলে যাচ্ছি— যে কোনো কাজ ঘর ঝাঁট দেয়া থেকে শুরু করে বাথরুম পরিষ্কার সব ওকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। কোনো সমস্যা নেই।

শায়লা চায়ের কাপ নিজাম সাহেবের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সহজ গলায় বললেন, মজনু সম্পর্কে একটা কথা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছি ভাই। আপনাকে আমি খুব কাছের মানুষ মনে করি বলেই বলছি। আপনার সঙ্গে ভাড়াটে বাড়িওয়ালা সম্পর্কে থাকলে কখনো বলতাম না।

নিজাম সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, ঘটনা কি?

শায়লা বললেন, ঘটনা খুবই সামান্য। আপনার কানে তোলার মতো কোনো ঘটনাই না। কিন্তু আমার ছোট মেয়েটা খুবই নরম টাইপের। সে দারুণ আপসেট। এই জন্যেই আপনাকে বলা।

BANGLABOOK.COM

ব্যাপারটা বলুন তো ভাবী। ঘটনা মনে হয় কিছুটা আঁচ করতে পারছি। ঐ শুয়োরের বাচ্চা মীরা মা-মণির কাছে প্রেমপত্র পাঠিয়েছে?

প্রায় সে রকমই। তবে প্রেমপত্র না— মজনু প্রায়ই বাসায় টেলিফোন করে। মীরা টেলিফোন ধরলে— আজেবাজে কথা বলে। অশ্লীল কথা।

বলেন কি?

শায়লা বললেন, ভাই এটা কোন বড় ব্যাপার না। মেয়ে বড় হলে এরকম সমস্যা বাবা-মা'কে পোহাতেই হয়। আপনাকে ব্যাপারটা জানতামই না। আপনাকে খুব কাছের মানুষ জানি বলেই বলছি। ভাই আরেকটা ভাপা পিঠা দেই।

দিন আরেকটা পিঠা খাই। শরীরে শক্তি করে নেই। তারপর দেখেন কি করি। আজ আমি এই শুয়োরের বাচ্চার পটকা গেলে ফেলব। ওর কিছু উপকার করব বলে সেধে নিয়ে এসেছিলাম। উপকারের ঘাড়ে লাথি। বাজারের পয়সা মারা। বিল দেয়ার জন্যে টাকা দিয়ে পাঠালে, বাসায় ফিরে এসে বলে— টাকা পকেট মার হয়েছে, এতো নৈমিত্তিক ঘটনা। এখন আবার হয়েছে প্রেম কুমার। ছাল নাই কুত্তার বাঘের মতো ডাক। ডাক আমি বের করছি।

শায়লা বললেন, একটু ধমক ধামক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেই হবে।

নিজাম সাহেব বললেন, শাস্তির ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন ভাবী। শাস্তি নিয়ে কিছু বললে আমি খুবই মাইন্ড করব।

নিজাম সাহেব খুব আয়োজন করেই শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। মীরাদের বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে একশ এক বার কানে ধরে উঠ-বোস। প্রতিবার উঠ-বোস করার সময় মুখে বলতে হবে "মীরা আমার মা"।

শাস্তি পর্ব শুরু হয়েছে। মজনুর হাত-পা কাঁপছে। চোখ লাল। শরীর দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। সে উঠ-বোস করছে— বিড়বিড় করে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলছে— মীরা আমার মা। মীরা আমার মা। তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে নিজাম সাহেব উঠ-বোসের হিসাব রাখছেন, ছয়-সাত-আট-নয়-দশ-এগারো...।

শায়লা রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। মীরা তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বলল, মা এসব কি হচ্ছে? মজনু ভাইকে কানে ধরে উঠ-বোস করাচ্ছে। মা প্লিজ বন্ধ কর। মা আমি তোমার পায়ে পড়ি।

শায়লা বিরক্ত গলায় বললেন, ন্যাকামী করবি না। ন্যাকামী করার মত কিছু হয় নি। শাস্তি পাওয়া দরকার ছিল, শাস্তি হচ্ছে।

মা প্লিজ, প্লিজ।

শায়লা কঠিন চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। মীরা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এল। তার ছুটে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। সে দরজার দিকে একঝলক তাকালো। গেটের বাইরে অনেক লোকজন জড় হয়েছে। সবাই খুব মজা পাচ্ছে। মীরা মজনুকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে নিজাম সাহেবের গলার স্বর শুনতে পারছে— একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ, চৌত্রিশ... একশ হতে আরো অনেক বাকি।

টেলিফোন বাজছে। মীরা টেলিফোনের কাছেই বসে আছে। তার টেলিফোন ধরতে ইচ্ছা করছে না। সে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করেছে— জীবনে কখনো টেলিফোন ধরবে না। শায়লা রান্নাঘর থেকে বললেন, মীরা টেলিফোন ধর।

মীরা টেলিফোন ধরল। তার সারা শরীর দিয়ে বরফের মতো শীতল কিছু বয়ে গেল। সেই ছেলেটা কথা বলছে।

হ্যালো মীরা তুমি কেমন আছ?

ভালো।

আজ তো তোমার বোনের এনগেজমেন্ট, দেখছ তোমার সব খবর রাখি। আচ্ছা তুমি কি এনগেজমেন্টের উপলক্ষে শাড়ি পরবে?

জানি না।

অবশ্যই জান— শুধু আমাকে বলতে চাচ্ছ না।

মীরা টেলিফোন রেখে দিল। সে মস্ত বড় একটা ভুল করেছে। টেলিফোন

যার সঙ্গে তার কথা হয় সে মজনু ভাই না। অন্য কেউ। মজনু ভাইও টেলিফোন করে কিন্তু সে হ্যালো শুনেই রেখে দেয়। মীরার শরীর কাঁপছে। সে কি করবে? নিজেই বারান্দায় ছুটে গিয়ে বলবে— "নিজাম চাচা যথেষ্ট হয়েছে। আর না।" এটা সে বলতে পারবে না। তার এত সাহস নেই। আপা থাকলে বলতে পারত। আপাকে দেখে মনে হয় সাহস নেই। কিন্তু তার অনেক সাহস।

নিজাম সাহেবের গলা শোনা যাচ্ছে। সত্তুর, একাত্তুর, বাহাত্তুর...। মজনু ভাই তার সঙ্গে বিড়বিড় করছেন, মীরা আমার মা। মীরা আমার মা। তবে এখন আর আমার শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে— মীরা মা। মীরা মা। আবারো টেলিফোন বাজছে। সেই ছেলে নিশ্চয়ই আবারো টেলিফোন করেছে। শায়লা রান্নাঘর থেকে ধমক দিলেন— মীরা টেলিফোন ধরছিস না কেন?

মীরা টেলিফোন ধরল। তার মাথা কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। টেলিফোনে কে কথা বলছে। কি বলছে— কিছুই বুঝতে পারছে না। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ছাদ থেকে কে যেন লাফ দিয়ে পড়েছে। তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। মীরা বলল, জ্বি আচ্ছা। জ্বি আচ্ছা। ওপাশ থেকে কে যেন বলল, এটা কি রং নাম্বার হয়েছে? মীরা তার উত্তরেও বলল, জ্বি আচ্ছা। মীরার সমস্ত মনোযোগ বারান্দায়। সেখানে শাস্তি পর্ব শেষ হয়েছে। নিজাম সাহেব বলছেন— যে ভাবে এক বস্ত্রে আমার বাসায় উঠেছিলি— ঠিক সেই ভাবে এক বস্ত্রে এখন বের হয়ে যাবি। গেট খুলে বের হয়ে যাবি। পেছন দিকে ফিরে তাকাবি না। দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষার কথা এতদিন শুধু বই-এ পড়েছি। আজ দেখলাম বাস্তবে।

মীরা জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মজনু ভাই চলে যাচ্ছে এই দৃশ্যটা সে দেখতে চাচ্ছে। মানুষটা গেট দিয়ে বের হবার সময় একবারও কি পেছন দিকে তাকাবে না?

রহমান সাহেব ছুটির দরখাস্ত নিয়ে নিজেই বড় সাহেবের কাছে গেলেন। বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, স্যার আজ আমার মেয়ের বিয়ে।

বড় সাহেব বললেন, মেয়ের বিয়ে?

জ্বি স্যার। আগে কথা ছিল এনগেজমেন্ট হবে— পরে ঠিক হয়েছে বিয়েই হয়ে যাবে। এই জন্যেই ছুটি।

মেয়ের বিয়ের দিন অফিস করবেন এটা কেমন কথা। অবশ্যই ছুটি। দরখাস্ত আমার পি.এ.-র কাছে রেখে চলে যান। ও আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেলাম,

একটা ছেলের চাকরির কথা বলেছিলেন মজনু নাম। আমার বড় শালাকে বলেছিলাম। সে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির জি এম। ও চাকরির ব্যবস্থা করেছে— স্টোর কিপার। চার হাজার ছয়শ' টাকা বেতন প্লাস আদার ফেসিলিটিজ।

স্যার আপনার অশেষ মেহেরবাণী।

বড় সাহেব বললেন, এত সহজে যে চাকরি হয়ে যাবে আপনি কি ভেবেছিলেন?

জ্বি স্যার ভেবেছিলাম। যে দিন আপনাকে বলেছি সেদিনই আমি জানি— মজনুর চাকরি হবে। আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

আগে থেকে জানলে তো ভালোই। আমার বড়শালার কার্ড আমি আমার পি এর কাছে দিয়ে রেখেছি। আপনি সেখানে থেকে নিয়ে যান। আর ঐ ছেলেকে পাঠিয়ে দিন। সব ঠিক করাই আছে। ইন্টারভ্যু টিন্টারভ্যু কিছু লাগবে না।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

রহমান সাহেব অফিস থেকে বের হলেন। তাঁর মন সামান্য খারাপ। রতন আজ অফিসে আসে নি। গত দিনই অফিস থেকে বের হবার সময় দেখেছিলেন রতনের জ্বর এসেছে। জ্বর নিশ্চয়ই বেড়েছে। তাঁর ইচ্ছা ছিল মেয়ের বিয়েতে রতনকে রাখবেন। যে কোনো শুভ কাজে সব প্রিয়জনদের পাশে রাখতে হয়। রতন তার প্রিয়জন তো বটেই। রতনের আগের বাসায় তিনি বেশ কয়েকবার গিয়েছেন। গত মাসে সে বাসা বদলেছে। নতুন বাসার ঠিকানা রহমান সাহেবের জানা নেই। জানা থাকলে তিনি অবশ্যই রতনকে দেখতে যেতেন।

রহমান সাহেব হাঁটতে শুরু করলেন। এই সময়ে অফিস থেকে বের হয়ে তাঁর অভ্যাস নেই। সব কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।

এত সকাল সকাল বাসায় ফিরে কি হবে? চুপচাপ ঘরে বসে থাকা ছাড়া তাঁর আর করার কি আছে? ঘরে থাকা মানেই মীরাকে বিরক্ত করা। তারচে নিউমার্কেটের কাচাবাজারে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করা যায়। চারটা ক্যাপসিকাম কিনে ফরিদার বাসায় চলে যাওয়া। নতুন একটা তরকারি খেয়ে দেখা দরকার। অনেকদিন গরুর গোসত দিয়ে ওল খাওয়া হয় না। ওল সামান্য গলায় ধরবে। অনেকে গরম পানিতে ওল সিদ্ধ করে সেই পানি ফেলে দিয়ে গলা ধরার সমস্যার সমাধান করে। রহমান সাহেব তাঁর পক্ষপাতি না। ধরুক একটু গলায়। তারও আলাদা মজা আছে। বাজারে কচুর লতি উঠেছে। চিকন চিকন কালো রঙের কচুর লতি চিংড়ি মাছ দিয়ে অসাধারণ হয়। তাঁর মা রাঁধতেন। তিনি কচুর লতির সঙ্গে কুচি কুচি করে কাঁঠাল বিচি দিয়ে দিতেন। সেই স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। ক্যাপসিকাম না কিনে কচুর লতি এবং কাঁঠাল বিচি কেনা যায়।

দুপুরে ফরিদার বাসায় খাওয়া দাওয়া করে তাকে নিয়েই নিজের বাসায় যাওয়া। চিত্রার এনগেজমেন্টে সে থাকবে না, তা হয় না। তাছাড়া এটা এনগেজমেন্টও না। রীতিমতো বিয়ে।

ফরিদার সঙ্গে জহিরের যে সমস্যা ছিল তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মিটে গেছে। ছোট ছোট ঝগড়া সহজে মিটতে চায় না। ছোট ঝগড়াগুলি চোর-কাটার মতো কাপড়ের এক জায়গা থেকে উঠে অন্য জায়গায় লাগে। বড়গুলি হল মানকাটার মতো। একবার তুলে ফেললে দ্বিতীয়বার লাগার সুযোগ নেই।

রহমান সাহেব বোনকে ফেলে নিজের মনে হেঁটে চলে এসেছিলেন— এই ব্যাপারটা তাঁর আর তেমন করে মনে পড়ছে না। তিনি কোনো অস্বস্তিও বোধ করছেন না। তিনি জানেন ফরিদা তাঁর ওপর খুবই রাগ করেছে। তবে এটাও জানেন সে রাগ করে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। পৃথিবীতে বোন ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই— এই কঠিন সত্যটা ফরিদা জানে। কাজেই সে তার ভাইজানের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবে।

তিনি কাঁচাবাজার থেকে বেশ কিছু বাজার করে ফেললেন। কচুর লতি, কাঁঠাল বিচি, দু'টা কলার থোর, লাউ ডগা। মাছের মধ্যে কিনলেন চিংড়ি মাছ আর মলা মাছ। এত বাজার পলিথিনের ব্যাগে করে নেয়া যায় না। তিনি দশ টাকা দিয়ে চটের একটা ব্যাগ কিনে ফেললেন। বাজার থেকে বের হবার মুখে হঠাৎ চোখে পড়ল কচি লাউ বিক্রি হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র লাউ গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে। তিনি তের টাকা দিয়ে একটা লাউ কিনলেন।

ফরিদার জন্যে একটা উপহার কিনতে ইচ্ছা করছে। খুব খুশি হয়ে যায় এমন কোনো উপহার। ফরিদার সবচে বড়গুণ হচ্ছে যে কোনো তুচ্ছ জিনিস পেয়েও সে খুশি হয়। সেই খুশির মধ্যে কোনো ভান থাকে না। একবার নিউমার্কেটের সামনে গোল প্লাস্টিকের বক্সে সুঁচ বিক্রি হচ্ছিল। বক্সের ভেতর অনেকগুলি খাপ। একেক খাপে একেক মাপের সুঁচ। ঢাকনা ঘুরিয়ে পছন্দসই মাপের সুঁচের কাছে গেলে সেই সুঁচ বের হয়ে আসে। তিনি সেই সুঁচের বাক্স বোনের জন্যে একটা কিনলেন। ফরিদা উপহার হাতে নিয়ে গাঢ় গলায় বলল, ভাইজান তুমি কোত্থেকে খুঁজে খুঁজে এমন সব অদ্ভুত জিনিস আমার জন্যে আন? কে তোমাকে এত কষ্ট করতে বলেছে? নিজের ওপর তোমার কোনো মায়া নেই। রোদে রোদে ঘুরে কি করেছ শরীরের অবস্থা। দেখি একটু দাঁড়াও তো তোমাকে সালাম করি।

সালাম করবি কেন?

একটা উপহার দিয়েছ আমি তোমাকে সালাম করব না। তুমি আমাকে কি ভাব?

রহমান সাহেবের স্পষ্ট মনে আছে সালাম করে উঠে দাঁড়িয়ে ফরিদা চোখ মুছতে লাগল। উপহার পাবার আনন্দে তার চোখে পানি এসে গেছে।

রিকশায় উঠে রহমান সাহেবের মনে হল বোনের জন্যে আজ ভালো কোনো উপহার নিতেই হবে। তাঁর সবচে পছন্দ কাচের চুড়ি। দুই বাক্স কাচের চুড়ি কিনে নিয়ে গেলে কেমন হয়? কাচের চুড়ি কোথায় পাওয়া যায় তিনি জানেন না। খুঁজে বের করা যাবে। রতন সঙ্গে থাকলে খুব সুবিধা হত। সে চেনে না এমন জায়গা নেই। কেউ যদি রতনকে বলে— রতন একটা ছ'মাস বয়েসী হাতির বাচ্চা কিনতে চাই। কোথায় পাওয়া যাবে বল তো। রতন সঙ্গে সঙ্গে বলবে, আসেন আমার সঙ্গে।

দুই বাক্স কাচের চুড়ি কিনে রহমান সাহেব ফরিদাদের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হলেন। সেখানে অনেক লোকজন— পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। বিরাট হৈচৈ। তিনি অবাক হয়ে শুনলেন— ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদ থেকে একটা মেয়ে লাফ দিয়েছে। মেয়েটার নাম ফরিদা। তখনো তিনি বুঝতে পারলেন না— এই ফরিদা তাঁর অচেনা কেউ না। ফরিদা তাঁরই বোন। ফরিদার জন্যেই তিনি দুই বাক্স কাচের চুড়ি এনেছেন।

অচেনা এক ভদ্রলোক রহমান সাহেবকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেল। জহিরকে শুকনো মুখে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার ঠোঁট চিমসে মেরে গেছে। সে সিগারেট টানছে। আর একটু পর পর থুথু ফেলছে। জহিরের সঙ্গে তার কিছু বন্ধু-বান্ধব। তারাও শুকনো মুখে সিগারেট টানছে। প্রত্যেকের চেহারাই কাকলাসের মতো। রহমান সাহেবকে দেখে জহির এগিয়ে এল। চিন্তিত মুখে বলল, ভাইজান দেখেছেন কি রকম বিপদে পড়েছি। পুলিশ টাকা খাওয়ার জন্যে নানান ফ্যাকড়া করছে। বলছে এটা নাকি সুইসাইড না, হত্যা। ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ছাদে তুলে পেছন থেকে নাকি ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে।

রহমান সাহেব বললেন, কে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে?

জহির বিরক্ত মুখে বলল, কেউ ফেলে নি। কে আবার ফেলবে। আমাকে বিপদে ফেলার জন্যে নিজেই ঝাঁপ দিয়েছে। তা ভাগ্য ভালো যে চিঠিতে আমার সম্পর্কে সত্যি কথাগুলি লিখেছে।

কি লিখেছে?

আমি যে স্বামী হিসেবে কত ভালো এইটা লিখেছে। সে যদি লিখত তার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী তাহলে আজ আমার খবর ছিল। তবে সমস্যা হয়েছে কি ভাইজান, চিঠিটা এখন আছে পুলিশের কাছে। আমার কাছ থেকে টাকা খাওয়ার জন্যে পুলিশ চিঠি গায়েব করে দিতে পারে। আমি চেষ্টা করছি মূল চিঠিটা, মূল চিঠি না হলে তার একটা ফটোকপি হলেও যোগাড় করতে। ফটোকপি আমি একজন ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে এটাচড করিয়ে নেব।

রহমান সাহেব কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর প্রচণ্ড ভয় লাগছে। বুক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ফরিদা মারা গেছে এই ব্যাপারটা এখনো তাঁর কাছে সে রকম স্পষ্ট হয় নি।

জহির হাতের সিগারেট ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরাল। রহমান সাহেবের দিকে ঝুঁকে এসে বলল, গত রাতে আপনি ফরিদাকে রেখে চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি দরজা খুলে তাকে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে। যা হবার হয়েছে। এখন ঘরে ঢোক। হাত মুখ ধুয়ে ভাত খাও। সে তখন বলল, "না"। তারপর রাগ দেখিয়ে ফট ফট করে ছাদে চলে গেল। আমার তখনই উচিত ছিল তাকে ছাদে যেতে না দেয়া। সে যে আমাকে এত বড় বিপদে ফেলবে আমি চিন্তাও করি নি।

রহমান সাহেব চুপ করে আছেন। তাঁর কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে যা ঘটছে তার কিছুই সত্যি না। স্বপ্নের ভেতর ঘটেছে। তিনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি জেগে উঠবেন। তখন আর এই ঝামেলায় থাকতে হবে না।

জহির বলল, ভাইজান চা খাবেন?

রহমান সাহেব বললেন, না। পানি খাব।

ঐ দোকানের দিকে চলেন, পানি খাবেন চাও খাবেন। এরা চা-টা ভালো বানায়। আমি ছয় কাপ চা খেয়ে ফেলেছি। সকালে নাশতা টাশতা কিছুই খাই নি। চায়ের ওপর আছি।

রহমান সাহেব যন্ত্রের মতো জহিরকে অনুসরণ করলেন। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন। জহির ভুল বলে নি। চা-টা ভালো। জহির বলল, ভাইজান আপনি এসেছেন খুব ভালো হয়েছে। আপনি আমার একটা উপকার করেন।

কি উপকার?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরতহাল হয়ে যাবে। টাকা দিয়ে ম্যানেজ করেছি। উপর থেকে মন্ত্রী লেভেলে চাপও দিয়েছি। ডাবল একশান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডেডবডি হ্যান্ডওভার করে দেবে। আমি আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের গাড়ি যোগাড় করেছি। আপনি ডেড বডি নিয়ে যান। আমি পুলিশের ঝামেলা শেষ করে আসছি।

রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কোথায় নিয়ে যাব?

জহির বিরক্ত মুখে বলল, আপনার বাড়িতে নিয়ে যান। এ ছাড়া তো আর জায়গা দেখি না। আমার ফ্ল্যাটে নেওয়াই যাবে না। রাজ্যের মানুষ ভিড় করে আছে। সাংবাদিক ফাংবাদিকও আছে। এরা ভেবেছে মশলাদার কোনো ঘটনা আছে— ফ্রন্ট পেজ নিউজ করে পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়াবে। চা আরেক কাপ খাবেন ভাইজান?

না।

খান আরেক কাপ। নার্ভ ঠিক থাকবে। চায়ের মধ্যে কেফিন আছে। কেফিন নার্ভ ঠিক রাখে। এই আমাদের আরো দু'কাপ চা দাও। ভাইজান আপনি চায়ের সঙ্গে সিগারেটও ধরান। চায়ের কেফিন আর সিগারেটের নিকোটিন— দুইটায় মিলে নার্ভ একেবারে পুকুরের পানির মতো ঠাণ্ডা রাখবে। আমি যে এত নর্মাল আছি— এই দুই বস্তুর জন্যে আছি। সকালে খুবই কান্নাকাটি করেছি। তারপর ভাবলাম— আগে কাজ গুছায়ে নেই— তারপর কান্নাকাটি। কান্নাকাটির সময় পার হয় নাই। সারাজীবনই কান্নাকাটির জন্যে পড়ে আছে।

রহমান সাহেব আরেক কাপ চা নিলেন। সিগারেট ধরালেন। তাঁর কাছে মনে হল জহির সত্যি কথাই বলেছে। শরীরের কাঁপুনিটা কমে এসেছে। জহির বলল, ভাইজান তাহলে আপনি এই উপকারটা করুন। ডেডবডি নিয়ে আপনার বাসায় চলে যান। আমি পুলিশের ঝামেলা শেষ করে, আজিমপুর গোরস্থানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে আসছি। কোরানে হাফেজ টাফেজ জাতীয় কাউকে পান কি-না দেখেন। কোরান পাঠ করতে থাকুক। টাকা-পয়সা যা লাগে আমি দেব।

রহমান সাহেব বললেন, আচ্ছা।

জহির বলল, আপনি যে শক্ত আছেন এটা দেখে ভালো লাগছে। বিপদের সময় কেউ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না। আপনাকে দেখলাম মাথা ঠাণ্ডা। আপনার ব্যাগে কি?

বাজার।

জহির ব্যাগের ভেতর উঁকি দিয়ে বলল, লাউটা ভালো কিনেছেন। লম্বা লাউ মিষ্টি হয়। গোল লাউ দেখতে ভালো, কিন্তু খেতে ভালো না। লাউ কিনে আপনি জিতেছেন।

লাশের গাড়ির ভেতর রহমান সাহেব বসে আছেন। পাশাপাশি দু'টা লম্বা সিট।

একটায় তিনি বসেছেন। অন্যটায় ফরিদা শুয়ে আছে। শাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। রহমান সাহেবের কাছে মনে হচ্ছে— এ আসলে ফরিদা না। অন্য কেউ। কিশোরী কোনো মেয়ে। শাদা কাপড়ে ঢাকা বলেই কি না— ফরিদাকে খুব ছোট খাট মনে হচ্ছে। রহমান সাহেবের দমবন্ধ লাগছে। লাশের গাড়িটা পুলিশের প্রিজন ভ্যানের মতো। কোনো জানালা নেই। একটা ছোট্ট রেলের টিকিট ঘরের জানালার মতো জানালা আছে। এই জানালা দিয়ে গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গেই শুধু কথা বলা যায়। বাইরের কিছু দেখা যায় না।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ড্রাইভারকে এখনো বলা হয় নি কোথায় যেতে হবে। ড্রাইভার অবশ্যি একবার জিজ্ঞেস করেছে— কোনদিকে যাব? রহমান সাহেব কিছু বলেন নি। গাড়ি কোথায় যাবে তিনি জানেন— কিন্তু জায়গাটার নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে না। একটু পরেই মনে আসবে।

রাস্তার কোনো গর্তে গাড়ি প্রবল ঝাঁকুনি খেল। ফরিদা সিট থেকে পড়ে যাচ্ছিল, রহমান সাহেব ছুটে এসে তাকে ধরলেন। আর তখনি ফরিদা কথা বলে উঠল। চৌবাচ্চার মাছটা যে রকম ক্ষীণ স্বরে কথা বলেছিল সে রকম ক্ষীণ স্বর। কিন্তু স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ।

ভাইজান তুমি এটা কি করছ?

রহমান সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, কি করেছি?

আমাকে কোন বুদ্ধিতে তুমি তোমার বাসায় নিয়ে যাচ্ছ? আজ তোমার মেয়ের বিয়ে। কত লোকজন আসবে। একটা শুভ কাজ হবে। এর মধ্যে তুমি একটা মরা লাশ নিয়ে উপস্থিত হবে। কি সর্বনাশের কথা।

তাহলে কি করব?

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা ধর। ড্রাইভারের চোখের আড়াল হওয়ামাত্র একটা বেবিটেক্সি নিয়ে বাসায় চলে যাও।

কি বলছিস তুই?

তোমার যাতে ভালো হয় আমি তাই বলছি।

তারপর তোর কি হবে?

আমার যা হয় হবে। মৃত মানুষের কিছু হয় না। তোমার বাড়িতে আজ উৎসব। তুমি যাও তো।

ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দু'বার হর্ন দিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, কোথায় যাব বলেন।

রহমান সাহেব বললেন, ভাই গাড়িটা থামান আমার একটু নামতে হবে।

দু'মিনিট। পিছনের দরজাটা খুলে দেন।

ব্যাপার কি?

ভাইসাহেব বাথরুমে যাব।

ড্রাইভার গাড়ি থামাল। রহমান সাহেব গাড়ি থেকে নামলেন। বিনীত গলায় বললেন, বেশিক্ষণ লাগবে না। পাঁচ মিনিট। আপনি একটা সিগারেট ধরান। সিগারেট শেষ করতে করতে আমি চলে আসব।

ড্রাইভার সিগারেট ধরাল না। নিজের সিটে ফিরে গম্ভীর মুখে বসে রইল। রহমান সাহেব বড় বড় পা ফেলে উল্টো দিকে হাঁটা ধরলেন। লাশের গাড়ি চোখের আড়াল হওয়া মাত্র প্রায় লাফ দিয়ে একটা রিকশায় উঠে পড়লেন।

BANGLABOOK.COM

দুপুর থেকে শায়লার মাথার যন্ত্রণা শুরু হল।

চিত্রা বলে গেছে এগারোটার মধ্যে ফিরবে। এখন বাজছে একটা দশ। শায়লা অস্থির হয়ে পড়লেন। চিত্রার অনেক বান্ধবীর টেলিফোন নাম্বারই তিনি জানেন। টেলিফোনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ করাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছেন না। চিত্রা ঠিকই ফিরে আসবে, মাঝখান থেকে খবর রটবে বিয়ের দিন মেয়ে পালিয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।

ঝামেলা যখন শুরু হয় চারদিক থেকে শুরু হয়। উত্তরার বড় আপা আসেন নি। ইসিজি করার পর ডাক্তার তাকে বলেছে কমপ্লিট রেস্টে থাকতে। টেলিফোনেও যেন কারো সঙ্গে কথা না বলেন। তিনি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে তাঁর বাড়িতে শুয়ে আছেন। এই সময় পাশে থাকলে শায়লা তাঁর টেনশানটা ভাগাভাগি করতে পারতেন। তাছাড়া একটা আইটেম তাঁর রান্না করে নিয়ে আসার কথা। সেই আইটেমও সম্ভবত আসবে না।

মীরা নিজের ঘরে শুয়ে আছে। কান্নাকাটি করছে। কিছুক্ষণ আগেই মীরার সঙ্গে তিনি রাগারাগি করে এসেছেন। বিছানায় পড়ে কান্নাকাটি করার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নি। এইসব নাটকের কোনো মানে হয় না। একটা ছেলে অন্যায় করেছে। শাস্তি পেয়েছে। এখানেই শেষ। শাস্তিটা হয়তো সামান্য বেশি হয়েছে। সেই বেশির দায়িত্বও মীরার না। সে শাস্তি দেয় নি। তাহলে বিছানায় শুয়ে বালিসে মুখ গুঁজে ফোঁপানোর মানে কি? তিনি মীরার ঘরে ঢুকে বলেছেন, মীরা কি হয়েছে?

মীরা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলেছে কিছু হয় নি।

তুই ফুঁপাচ্ছিস কি জন্যে?

মন খারাপ লাগছে মা। খুবই মন খারাপ লাগছে। আমার মন যে কি পরিমাণ খারাপ তুমি বুঝতেই পারবে না।

কেন মন খারাপ হয়েছে? প্রেমিক কানে ধরে উঠ-বোস করছে এই জন্যে?

মা তুমি বুঝবে না।

আমি বুঝব না আর তুই সব বুঝে ফেলছিস? খবর্দার ফুঁপাবি না। উঠে আয়।

না।

না মানে? না মানে-কি?

না মানে না। আমি ঘর থেকে কোথাও বের হব না। তুমি আমাকে বিরক্ত করবে না।

শায়লা তখন আর নিজের রাগ সামলাতে পারেন নি। মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিয়েছেন। চড় খুব জোরালো হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গালে আঙুলের দাগ বসে গেছে। মীরা চুপ করে ছিল। পাথরের মূর্তির মতো বসে মা'র দিকে তাকিয়েছিল। শায়লার ইচ্ছা করছিল আরেকটা চড় লাগাতে। অনেক কষ্টে নিজের ইচ্ছা দমন করলেন।

এখন শায়লা বারান্দায় বসে আছেন। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। দূরে কোনো রিকশা দেখলেই তাকাচ্ছেন— যদি চিত্রাকে দেখা যায়। অন্যদিন একের পর এক রিকশা যায়। আজ তাও যাচ্ছে না। একের পর এক ট্রাক-বাস যাচ্ছে। আচ্ছা চিত্রা কোনো একসিডেন্ট করেনি তো। কোনো ট্রাক হঠাৎ... ছিঃ ছিঃ এইসব কি ভাবছেন?

এত বড় একটা অনুষ্ঠান হবে অথচ বাসায় কেউ নেই। চিত্রার বাবা এক ঘন্টার ভেতর ফিরবে বলে অফিসে গেছে এখনো ফিরে নি। হয়তো আজো ফিরবে না। রাত দশটার দিকে তাকে দেখা যাবে। বোনের বাসায় গিয়ে ভাত টাত খেয়ে ফিরবে। ততক্ষণে বিয়ে হয়ে গেছে। বরপক্ষের লোকজনের সঙ্গে চিত্রা চলে গেছে।

চিত্রার বাবার বাড়িতে থাকা না থাকা অবশ্যি একই। বাসায় থাকলে ঘরের এক কোনায় ফার্নিচারের মতো পড়ে থাকবে। তবুও তো একটা মানুষ প্রয়োজনে এখানে ওখানে পাঠানো যেত। একশ টাকার কিছু নতুন নোট তাঁর দরকার। মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে মেয়ের হাতে কিছু টাকা দিয়ে দিতে হবে। পুরনো ময়লা নোট না। চকচকে নতুন নোট। ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাংকে গেলে নতুন নোট এখন পাওয়া যাবে না। গুলিস্তানে পুরনো নোট বদলে নতুন নোট দেয়। একশ টাকায় বিশ টাকা বাটা কেটে রাখে। চিত্রার বাবা থাকলে হাজার দুই টাকার নতুন নোট আনানো যেত। মজনু ছেলেটা থাকলেও হত— এইসব কাজে সে খুব পাকা। তার শাস্তিটা না হয় একদিন পরে হত।

মজনুকে নিয়েও তাঁর এখন ভয় লাগছে। যে অপমান তাকে করা হয়েছে এই

অপমান ভোলা মুশকিল। কোনো একদিন যদি অপমানের শোধ নেয় তখন কি হবে? দূর থেকে বাড়িতে একটা বোমা মেরে দিল। কিংবা এমনও তো হতে পারে— মীরা রিকশা করে যাচ্ছে— তার গায়ে এসিড ছুড়ে মারল।

শায়লা বারান্দা থেকে উঠে রান্নাঘরে গেলেন। সব রান্নাবান্না তিনি নিজে করবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন— এখন রান্নায় মন বসছে না। জইতরীর মা'কে সব বুঝিয়ে এসেছেন। জইতরীর মা'র দাঁতে ব্যথা শুরু হয়েছে। সে দাঁতের ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতেই রান্না করছে। কি করছে কে জানে। হয়তো লবণের জন্যে কিছু মুখেই দেয়া যাবে না।

শায়লা রান্নাঘরে ঢুকতেই জইতরীর মা বলল, বড় আফা আসছে আম্মা?

শায়লা কঠিন মুখে বললেন, বড় আপা এসেছে কি আসে নি এটা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার কাজটা ঠিকমতো কর।

জোহরের আজান হইছে অখনও আফা আসল না। আমার ভালো ঠেকতাছে না আম্মা।

শায়লা বিরক্ত গলায় বললেন, ও বলেই গেছে দেরি হবে। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম। কোথাও আটকা পড়ে গেছে।

একটা টেলিফোন করেন আম্মা।

শায়লা বললেন, তোমাকে বুদ্ধি বাতলাতে হবে না। তুমি তোমার কাজ কর। লবণ ঠিকঠাক আছে কি-না এটা দেখ। এতদিনেও তোমার তো লবণের আন্দাজ হয় না। হয় লবণ বেশি হবে, নয় কম।

শায়লা রান্নাঘর থেকে বের হলেন। চিত্রার একটা মোবাইল টেলিফোন আছে। সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা তাঁর মনে হয় নি কেন? এই কাজটা তো তিনি অনেক আগেই করতে পারতেন। তিনি প্রায় ছুটেই টেলিফোনের কাছে গেলেন। অনেক মোবাইল আছে টি এন্ড টি'র লাইন থেকে কানেকশান যায় না। চিত্রারটাতে যায়। চিত্রার মোবাইল নাম্বার শায়লার মুখস্থ। তারপরেও টেলিফোনের বইটা পাশে নিয়ে বসলেন। হ্যাঁ রিং হচ্ছে। একবার দু'বার, তিনবার, চারবার। তারপর হঠাৎ মোবাইল অফ হয়ে গেল। চিত্রা মোবাইল অফ করে দিয়েছে। এর মানে কি? শায়লার সারা শরীর ঝিম ঝিম করছে। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন— দু'টা দশ বাজে। একটু আগেই তো ছিল একটা, এত তাড়াতাড়ি দু'টা দশ হয়ে গেল কি ভাবে?

মাছের চৌবাচ্চার উপর একটা দাঁড়কাক বসে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। শুভ কাজে দাঁড়কাক দেখা ভয়ঙ্কর অলক্ষণ।

রহমান সাহেব রিকশায় বসে আছেন। তাঁর হাতে বাজারের ব্যাগ। লাউ এর মাথা ব্যাগ থেকে বের হয়ে আছে। তিনি তাকিয়ে আছেন লাউটার দিকে। তাঁর পরিষ্কার মনে আছে কেনার সময় লাউটা ছিল ধবধবে শাদা। এখন কেমন কালচে দেখাচ্ছে। এর মানে কি? লাউ বদল হবার তো কোনো সম্ভাবনা নেই। এমন না যে তিনি শাদা লাউ কিনেছেন আর দোকানি ভুলে তার ব্যাগে কালো রঙের একটা লাউ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে তিনি নিজের হাতে লাউটা ঢুকিয়েছেন। লাউটার রঙ বদলে গেল কি ভাবে? রহমান সাহেব খুবই দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন।

রিকশাওয়ালা বলল, চাচামিয়া কোনদিকে যাব?

রহমান সাহেব চমকে উঠলেন। কোন দিকে যাবেন তিনি মনে করতে পারছেন না। সব এলোমেলো লাগছে। অতি দ্রুত তাঁর বাসায় যাওয়া উচিত। চিত্রার বিয়ে। লোকজন আসবে। কিন্তু তাঁর বাসাটা কোথায়? বাড়ি দেখলে তিনি অবশ্যই চিনতে পারবেন। বাড়ির সামনে জোড়া বাগানবিলাস। একটার ফুল শাদা আরেকটা নীলচে ধরনের লাল। বাইরের উঠোনে চৌবাচ্চা আছে। চৌবাচ্চায় চিত্রার মা মাছ ছেড়েছে। এই মাছগুলির একটা আবার তার সঙ্গে কথা বলেছে।

রিকশাওয়ালা আবার বলল, চাচামিয়া কোন দিকে যাব?

রহমান সাহেব হতাশ গলায় বললেন, মনে পড়ছে না। একটু পরেই মনে পড়বে। ভাই, দু'টা মিনিট সবুর কর।

রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে ফেলল। তার চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। রহমান সাহেব রিকশার সীটে বসে আছেন। বাসার ঠিকানা মনে করতে চাচ্ছেন। যতই মনে করতে চাচ্ছেন ততই সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সামনের রাস্তায় বড় একটা ডিসপেনসারি আছে। ডিসপেনসারির নাম আরোগ্য। তারপর মনে হল এই ডিসপেনসারিটা তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায় না। অন্য কোথাও। খুব সম্ভব তাঁর অফিসের রাস্তায়। ডিসপেনসারিতে একজন কর্মচারী বসে থাকে। তার গায়ে হলুদ কোট। সে খুবই পান খায়। তার থুতনীতে ছাগলাদাড়ির মতো কিছু দাড়ি। পান

খাবার সময় দাড়ি নড়ে। দেখতে মজা লাগে। তিনি অফিসের ঠিকানা মনে করতে চেষ্টা করলেন। সেই ঠিকানাও মনে পড়ছে না। তাঁর প্রচণ্ড পানির পিপাসা হচ্ছে। তিনি রিকশাওয়ালার দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বললেন, এক গ্লাস পানি খাব।

রিকশাওয়ালা বলল, চাচামিয়া আপনে নামেন। অন্য রিকশায় যান। আমি অখন ভাড়া যামু না।

রহমান সাহেব নেমে পড়লেন। যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে হাঁটা ধরলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের গাড়ির কাছে এসে পড়লেন। গাড়ির ড্রাইভার তাঁকে দেখে কঠিন গলায় বলল— গিয়েছিলেন কোথায়? চল্লিশ মিনিট ধরে বসে আছি।

রহমান সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন— ডিসপেনসারিতে হলুদ কোট গায়ে যে কর্মচারীর কথা তিনি ভাবছিলেন আসলে ঘটনা অন্য। এই গাড়ির ড্রাইভারের গায়ে হলুদ কোট। থুতনীতে ছাগলাদাড়ি। আতর মেখেছে বলে ড্রাইভারের গা থেকে কড়া গন্ধ আসছে। এই গন্ধটা আগে পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন আতরের গন্ধের জন্যে পাশে দাঁড়ানো যাচ্ছে না।

ড্রাইভার বিরক্ত মুখে বলল, উঠেন গাড়িতে উঠেন।

রহমান সাহেব বললেন, ভাইসাহেব আমার একটা সমস্যা হয়েছে। আমার কিছু মনে আসছে না। কোথায় যাব বুঝতে পারছি না।

ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, এইসব কি বলেন?

রহমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ভাইসাব আমি কি করব আপনি একটু বলে দেন। মনে হয় আমি পাগল হয়ে গেছি। পাগলদের কোনো ঠিকানা মনে থাকে না।

আপনার কোনো ঠিকানা মনে নাই?

জ্বি না।

গাড়িতে যে লাশ, সে আপনার কে হয়?

আমার বোন হয় তার নাম ফরিদা। তার নাম মনে আছে।

বোনের বাসা কোথায়?

মনে আসছে না। ভাই সাহেব।

ড্রাইভার বলল, আসুন আমার সঙ্গে আপনার মাথায় পানি ঢালি। দুঃখ ধান্ধায় মাথা গরম হয়ে গেছে— আর কিছু না। পানি ঢাললে ঠিক হয়ে যাবে। তিন চার বালতি পানি ঢালতে হবে। এই জিনিস আগেও দেখেছি।

রহমান সাহেব বাধ্য ছেলের মতো ড্রাইভারের পেছনে পেছনে একটা চায়ের দোকানে যাচ্ছেন।

শায়লার বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। চিত্রা এসেছে তিনটায়। এসেই গোসল করে সাজতে শুরু করেছে। চিত্রাকে সাহায্য করছে মীরা। মীরা এখন আনন্দিত। তাকে দেখে মনেই হচ্ছে না একটু আগেই সে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল। শায়লার নিমন্ত্রিত লোকজন আসা শুরু করেছেন। উত্তরা থেকে শরীর খারাপ নিয়ে এসেছেন চিত্রার খালা। তাঁর একটা আইটেম আনার কথা, তিনি দু'টা আইটেম এনেছেন।

পাঁচটার সময় শায়লাকে অবাক করে দিয়ে ফ্ল্যাগ উড়ানো গাড়ি নিয়ে পূর্তমন্ত্রী চলে এলেন। সঙ্গে পুলিশের গাড়ি। তিনি শায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন— ভাবী আমি সালু। পূর্তমন্ত্রী। লোকজন অবশ্য বলে ধূর্তমন্ত্রী। হা হা হা। রহমান আমাকে বলল, তার মেয়ের বিয়ে আমি যেন আসি। কাজ কর্ম ফেলে চলে এসেছি। রহমান কোথায়?

শায়লা বললেন, ওকে একটা কাজে পাঠিয়েছি। এসে পড়বে। আপনি বসুন।

আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না ভাবী। আমি আছি। মেয়ের বিয়ে শেষ করে যাব।

শায়লার অফিসের ডিরেক্টর সাহেব এসেছেন। এই ভদ্রলোকের স্ত্রী জার্মান। অতি রূপবতী মহিলা। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলছেন। শায়লা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বরপক্ষের লোকজনরা দেখবে কনে পক্ষের লোকজনও তুচ্ছ করার মতো না। ভাবতেই ভালো লাগছে।

আয়োজনের কোনো খুঁত নেই। চকচকে দু'হাজার টাকার নোট নিজাম সাহেব গুলিস্তান থেকে নিয়ে এসেছেন।

শায়লার বাড়ি লোকজনে গমগম পড়ছে। বরপক্ষের লোকজন আসছে। পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গের পুলিশের গাড়ির পুলিশ ট্রাফিক কনট্রোল করছে। আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখে আনন্দে শায়লার চোখে পানি এসে গেল। মীরা এসে তাঁকে বলল, মা কি সর্বনাশ। গেস্টরা সব এসে গেছে, তুমি তো এখনো শাড়ি বদলাও নি। তাড়াতাড়ি বাথরুমে যাও।

আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের গাড়িটা নেত্রকোনার দিকে যাচ্ছে। রহমান সাহেবের গ্রামের বাড়ির ঠিকানা মনে পড়েছে। বোনকে নিয়ে তিনি গ্রামে রওনা হয়েছেন। ড্রাইভার নিজেই আগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। "এত দূর যেতে পারব না। বাড়তি টাকা লাগবে।" এ জাতীয় কথা একটিও বলে নি।

রহমান সাহেবের কেমন যেন শান্তি শান্তি লাগছে। যেন তিনি মস্তবড় একটা সমস্যার হাত থেকে বেঁচেছেন। সামনে আর কোনো সমস্যা নেই। তিনি নিচু স্বরে হঠাৎ হঠাৎ ফরিদার সঙ্গে কথাও বলছেন। তাঁর মনে হচ্ছে ফরিদা মারা যাবার পরও তার কথা বুঝতে পারছে। এবং ফরিদা নিজেও টুকটাক দু'একটা কথা বলছে। যেমন ফরিদা বলল— ভাইজান তুমি যে চুড়িগুলি আমার জন্যে কিনেছ সেগুলি পরিয়ে দাও।

তিনি বললেন, মরা মানুষের হাতে চুড়ি পরানো ঠিক না।

ফরিদা বলল, কেউ তো আর দেখছে না। ভাইজান তুমি পরিয়ে দাও। বাম হাতে পরাও, ডান হাত থ্যাতলে ভেঙে এমন হয়েছে চুড়ি পরাতে পারবে না।

বোনের আবদার রক্ষার জন্যেই রহমান সাহেব চুড়ি পরাচ্ছেন। তাঁর খুবই মায়া লাগছে। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

ফরিদা রাগী গলায় বলল, কাঁদবেনা তো ভাইজান। পুরুষ মানুষ কাঁদছে দেখতে আমার বিশ্রী লাগে। পুরুষ মানুষ হবে বাবুর বাবার মতো শক্ত।

রহমান সাহেব চেষ্টা করছেন কান্না থামাতে। পারছেন না। তাঁর চোখের পানি ফরিদার ডান হাতের তালুতে টপ টপ করে পড়ছে।

যে কেউ দেখলেই বলবে প্রথম বৃষ্টির পানি মেয়েরা যে ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ধরে, ফরিদাও ঠিক সেই ভঙ্গিতে ভাইয়ের চোখের অশ্রু হাত বাড়িয়ে ধরছে। এখনই বুঝি এই অশ্রু সে তার গালে মাখবে।